قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَانْتَشِرُوافِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰه

আল্লাহ পাক বলেন– "অতঃপর তোমরা জমীনে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহ্‌র দান রিজিক তালাশ করিতে থাক"

ফাজায়েলে তেজারত

فَضَائِلِ التِجَارَة

মূল লিখক

শায়খুল হাদীছ হজরত মাওলানা জাকারিয়া ছাহেব (রহঃ)

অনুবাদক

মাওলানা মোঃ ছাখাওয়াত উল্লাহ

মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন রিসার্চ স্কলার

পরিবেশক

তাবলীগী কুতুবখানা

৬০ নং চক সার্কুলার রোড

চক বাজার, ঢাকা – ১২১১

—ঃসূচীপত্রঃ—

نحمده ونصلي على رسوله الكريم حامدا ومصليا ومسلما

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

শায়খুল হাদীছ হজরত মাওলানা জাকারিয়া ছাহেব ফরমাইতেছেন –

মোজাদ্দেদে তাব্লীগ চাচাজান হজরত মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াছ ছাহেব দেহ্লবী (রহঃ) এর এরশাদ মোতাবেক এই অধম পাপী জাকারিয়ার লিখনীর সাহায্যে ইতিপূর্বে ফাজায়েলে আ'মালের কয়েকখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও চাচাজান মরহুমের আদেশের বরকতে এবং আল্লাহ তায়ালার অবর্ণনীয় বখ্শিশের বদৌলতে ঐ সব গ্রন্থ মুছলিম সমাজে খুব বেশী বেশী সমাদৃত হইয়াছে।

'হে খোদা! তুমিই একমাত্র যাবতীয় প্রশংসার মালিক।' চাচাজান জীবনের শেষ দিনগুলিতে দুইটি গ্রন্থ রচনা করার জন্য আমাকে খুব বেশী বেশী তাকীদ করিতেন, প্রথমটি আল্লাহ্র রাস্তায় দান সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি ফাজায়েলে তেজারত সম্পর্কে। তন্মধ্যে ১ম গ্রন্থটি ফাজায়েলে ছাদাকাত নামে অনেক আগেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু তেজারত সম্পর্কীয় বইখানা বারংবার তাকীদ সত্ত্বেও লিখিত হয় নাই। অতঃপর চাচাজান যখন খুব বেশী অসুস্থ হইয়া পড়েন আমিও তাঁহার আদেশ পালনার্থে ব্যস্ত হইয়া পড়ি এবং তাহার জীবদ্দশায়ই তেজারত বইখানা রচনা শুরু করিয়া দেই ও পাণ্ডুলিপিখানা মোটামুটি কয়েকটি অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া সাজাইয়া শ্রদ্ধেয় চাচাজানের খেদমতে পেশ করি। আমার খুবই ইচ্ছা ছিল বইখানা তাঁহাকে আদ্যোপান্ত শুনাইয়া উহার মধ্যে কিছুটা রদবদল বা সংশোধন করিতে হইলে তাহা করাইয়া নিব। কিন্তু তিনি গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার খাছ খাছ বন্ধুবান্ধবদেরকে দেখাইবার

জন্য নির্দেশ দেন। চাচাজানের ক্রমাগত অসুস্থতার দরুন তাঁহাদের দেখা শুনার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। ইত্যবসরে হজরত চাচাজানও এন্তেকাল করিয়া যান।

প্রথমতঃ ছাহারানপুর মাজাহেরুল উলুম মাদ্রাসার অধ্যাপনা ও এন্তেজামের ঝামেলায় এবং হাদীছ শরীফের শরাহ লেখার ব্যস্ততায় আমি এই কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করায় খুবই অনুতপ্ত আছি। বর্তমানে মদীনায়ে মোনাওয়ারায় হিজরত অবস্থায় যদিও মাদ্রাসার ঝামেলা হইতে মুক্ত তবুও বিভিন্ন প্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত দুর্বল হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু যখনই মরহুম চাচাজানের সেই তাকীদ ও নির্দেশ মনে আসিয়া যায় তখনই স্বীয় ব্যর্থতার জন্য মনে দারুন অনুশোচনা অনুভব করি। কয়েক মাস যাবত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার দরুন যে কোন প্রকার এলেমের খেদমত হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি তবুও চাচাজানের সেই স্নেহভরা নির্দেশ বারংবার মনের মাঝে উঁকি মারে। তাই অদ্য সতেরই জিলহজ্জ ১৩৯৯ হিজরী বুধবার রাত্রে মসজিদে নববীতে বিছমিল্লাহ্ পড়িয়া শুরু করিয়া দিলাম এবং বরকতের জন্য কিতাবের শুরুতে হজরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর বেহেশ্তী জেওর হইতে একটি অংশ উল্লেখ করিতেছি যাহা তিনি বেহেশ্তি জেওর ৫ম খন্ডের পিছনে 'হালাল উপার্জন' শিরোনামে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

হালাল মাল উপার্জন করার বর্ণনা

(১) হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, "হালাল মাল উপার্জন করা অন্যান্য ফরজের পর অন্যতম ফরজ"।

অর্থাৎ কালেমার পর ইছলামের যে চারটি ফরজ রহিয়াছে – নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাত, উহাদের ন্যায় হালাল মাল উপার্জন করাও একটি ফরজ। তবে ঐ চারটি হইতে ইহা নিম্নস্তরের ফরজ। আর এই ফরজ ঐ ব্যক্তির জিম্মায় যে নিজের খরচ বা পারিবারিক খরচের জন্য অভাবগ্রস্থ। যাহার এইরূপ কোন অভাব নাই যেমন তাহার প্রয়োজনীয় সম্পত্তি রহিয়াছে বা অন্য কোন প্রকারে সে সম্পদের অধিকারী হইয়াছে এমতাবস্থায় তাহার উপর নূতন করিয়া রোজগার করা ফরজ নয়। কেননা মাল আল্লাহ পাক মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পয়দা করিয়াছেন যেন মানুষ তাহার অভাব দূর করিয়া আল্লাহ্‌র এবাদতে মনোযোগ দিতে পারে; যেহেতু খাওয়া পরা ব্যতীত আল্লাহ্‌র এবাদত করা যায় না, সুতরাং বুঝা গেল মাল মুখ্য উদ্দেশ্য নয় বরং পরোক্ষ উদ্দেশ্য। কাজেই যখন প্রয়োজন পরিমাণ ধন সম্পদ আয়ত্তে আসিয়া গেল তখন লোভ লালসার বশবর্তী হইয়া উহাকে আরও বাড়াইবার জন্য মেহনত করা উচিত নয়। অতএব যাহার নিকট প্রয়োজনীয় সম্পদ রহিয়াছে উহাকে আরও বাড়াইবার চেষ্টা করা তাহার উপর ফরজ নয়, বরং ধন- দৌলতের লোভ মানুষকে খোদার স্মরণ হইতে উদাসীন করিয়া দেয় ও উহার প্রাচুর্য মানুষকে বিভিন্ন প্রকার পাপকার্য্যে লিপ্ত করিয়া দেয়।

খুব গুরুত্ব সহকারে বুঝিয়া লও এবং এ বিষয়ে লক্ষ্য কর যে, মাল দৌলত যেন হালাল তরীকায় উপার্জিত হয়। হারামের প্রতি মুছলমানের একেবারেই ভ্রূক্ষেপ করা উচিত নয়, কেননা সেই মালে কোন বরকত হয় না; আর যে ব্যক্তি হারাম মাল ভক্ষণ করে সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানেই অপদস্ত হইবে এবং আল্লাহ পাকের আজাব ও গজবে লিপ্ত হইবে। কোন কোন নিরেট মূর্খ ব্যক্তি এই ধারণা পোষণ করে যে, বর্তমান জমানায় হালাল মাল উপর্জন করা অসম্ভব এবং হালাল মাল পাওয়া যাওয়াও মুশকিল, এই ধারা সম্পূর্ণ ভুল ও শয়তানের ধোঁকা মাত্র।

খুব ভাল করিয়া মনে রাখিবে, যাহারা শরীয়তের উপর আমল করিতে থাকে গায়েব হইতে তাহাদের সাহায্য আসে আর যে ব্যক্তি হালাল খাওয়ার ও হারাম হইতে বাঁচিয়া থাকিবার নিয়ত করে আল্লাহ পাক তাহাকে ঐ রকম মালই দান করিয়া থাকেন, ইহা বাস্তব ক্ষেত্রে সত্য, আবার পবিত্র কোরান ও হাদীছে ইহার ওয়াদাও আসিয়াছে। এই নাজুক জমানায় আল্লাহ্‌র যেই সমস্ত বান্দা হারাম এবং সন্দেহ জনক মাল হইতে স্বীয় নফ্‌ছকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে চমৎকার হালাল মাল দান করিয়া থাকেন এবং তাহারা হারামখোর লোকজন হইতে বেশ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং ইজ্জতের সহিত জীবন যাপন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি তাহার সহিত ও অন্যান্য লোকের সহিত আল্লাহ তায়ালার এই সুন্দর ব্যবহার দেখিতে পায় এবং কোরান এবং হাদীছের মধ্যে এইসব বিষয় প্রত্যক্ষ করে তাহারা ঐ সব জাহেলের কথায় কর্ণপাত করেনা, তবে যখন কোথাও ঐরূপ কথা দেখিতে পাওয়া যায় তবে উহার মতলব কোন দ্বীনদার হক্কানী আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে ইহাতে খোদার রহমতে মনে সান্ত্বনা আসিয়া যাইবে ও এইরূপ আজেবাজে খট্‌কা বা অছ্‌ওয়াছা অন্তর হইতে মুছিয়া যাইবে।

বাস্তবিকই মানুষ মালের ব্যাপারে খুব কমই সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকে। নাজায়েজ চাকুরী করিয়া থাকে, অপরের হক নষ্ট করে, অথচ এই সব গর্হিত হারাম কাজ। আবারও তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখ যে, আল্লাহ্‌র দরবারে কোন জিনিসেরই অভাব নাই।

যাহা তোমার তক্বদীরে আছে উহা নিশ্চয় মিলিয়া যাইবে। ইহা সত্ত্বেও বদ নিয়ত রাখা, জাহান্নামে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা কেমন বুদ্ধির কাজ? যেহেতু হালাল উপার্জনের প্রতি মানুষের মনোযোগ খুবই কম তাই এই বিষয়ের প্রতি বিষদভাবে আলোকপাত করা হইল। দুনিয়াতে জ্বিন ইনছানের সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হইল তাহারা আল্লাহ্‌র এবাদত করিবে। সুতরাং প্রত্যেক ব্যাপারে এই কথাটা খুব গুরুত্ব সহকারে মনে রাখিবে। আর খানাপিনা তো শুধু এইজন্য যে উহা দ্বারা শক্তি পয়দা হইবে যদ্বারা

আল্লাহ্‌র এবাদত করা সহজ হইবে। অর্থ এই নয় যে, দিবারাত্রি শুধু ভোগ বিলাসেই লিপ্ত থাকিবে আর আল্লাহকে ভুলিয়া তাঁহার নাফরমানী করিতে থাকিবে। কোন কোন মূর্খ ব্যক্তির এই ধ্যান ধারণা যে দুনিয়াতে শুধু খাওয়া পরা এবং লজ্জত হাছেল করার জন্য আসিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা মূর্খতার সর্বনাশ করুক, কতবড় অন্যায় এবং বদ দ্বীনীর কথা।

(২) হাদীছ – হুজুর আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন, ‘কোন ব্যক্তি তাহার উভয় হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম খানা কখনও খাইতে পারে নাই এবং ইহা নিঃসন্দেহে যে আল্লাহ্‌র নবী হজরত দাউদ আলাইহিচ্ছালাম নিজ হাতে উপার্জন করিয়া খাইতেন।’

অর্থাৎ স্বহস্তে উপার্জন করিয়া ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা কতই না উত্তম। যেমন কোন পেশা বা ব্যবসা অবলম্বন করা, অযথা কাহারও উপর বোঝা হইয়া থাকা উচিত নয় আর কোন পেশাকে ঘৃণা করাও ঠিক নয়। উপরন্তু যখন এই সব কাজ স্বয়ং আম্বিয়ায়ে কেরামগণ করিয়া গিয়াছেন তখন তাহাদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আর কে হইতে পারে? বরং তাঁহাদের সমকক্ষ হওয়াও কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। একটি হাদীছে আসিয়াছে, এমন কোন নবী ছিলেন না যিনি বক্‌রী চরান নাই। খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও এবং মূর্খতা পরিহার কর। আবার কোন কোন লোকের ধারণা এই যে, যদি কাহারও নিকট হালাল মাল মওজুদ থাকে, তবে উহা তাহার নিজ উপার্জিত নয় বরং উত্তারাধিকার সূত্রে পাইয়াছে অথবা অন্য কোন বৈধ উপায়ে লাভ করিয়াছে এমতাবস্থায় বৃথা সে উপার্জ্জনের পিছনে লাগিয়া যায় এবং উপার্জনকে সে এবাদতে লিপ্ত থাকার চেয়ে উত্তম মনে করিয়া থাকে, ইহা মারাত্মক এক ভুল ধারণা। বরং এইরূপ লোকের জন্য এবাদতে লিপ্ত হওয়াই উত্তম। যখন আল্লাহ পাক সুখ শান্তি দান করিয়াছেন এবং জীবিকার ফিকির হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন তখন ইহা বড়ই না শোকরী এবং পরিতাপের বিষয় যে, ভাল ভাবে তাঁহার নাম স্মরণ না করিয়া শুধু ধন সম্পদ বাড়াইবার পিছনেই লাগিয়া যাইবে। বরং হালাল মাল মানহানিকর না হইয়া যে ভাবেই অর্জিত হউক না কেন

উহার সবটাই ভাল এবং উহা আল্লাহর একটা বড় নেয়ামত, উহার ক্বদর করা উচিত। অপব্যয় না করিয়া সুষ্ঠুভাবে খরচ করা উচিত এবং হাদীছের মতলব ত এই যে, কেহ যেন অন্যের উপর বোঝা হইয়া না দাঁড়ায়। শরীয়তের বিধান মোতাবেক ভীষণ মজবুরী ব্যতীত যেন মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া না ফিরে। এবং যে কোন পেশাকে ঘৃণা না করে, আর হালাল মাল তালাশ করে, উপার্জনকে দোষনীয় মনে না করে। এই জন্যই বিষয়টাকে কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইল, তবে যেন মানুষ উপার্জন করাকে খারাপ কাজ মনে না করে, বরং উপার্জন করে এবং নিজে খায় অন্যকে খাওয়ায় ও ছদকা খয়রাত করে।

হাদীছের অর্থ এই নয় যে, স্বহস্তে উপার্জিত মাল ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে বৈধ তরীকায় প্রাপ্ত ধন-সম্পদ হালাল নয় অথবা হাতের উপার্জিত সম্পদের সমকক্ষ নয়, বরং কোন কোন মালত হস্তোপার্জিত মাল হইতেও উত্তম। আবার অনেক মুর্খের দলতো আল্লাহ্ পাকের উপর তাওয়াক্কুল করনেওয়ালা খাঁটি বান্দাদের উপর নানা প্রকার বিদ্রুপ করিয়া থাকে। আর উহার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখিত হাদীছ পেশ করে যে, স্বহস্তে উপার্জন করা চাই। শুধু মাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকা এবং নজর নিয়াজের উপর জীবিকা নির্বাহ করা ঠিক নয়, ইহা তাহাদের ভীষণ মুর্খতা। বরং এই কটাক্ষ তো প্রিয় মাহ্বুব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ) পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। ভীষণ ভয়ের কথা, ঐ সব বুজুর্গানের প্রতি কটুক্তি করা ইহকাল ও পরকালে ধ্বংসের কারণ হইতে পারে। বরং আল্লাহ্র অলিদের সহিত বে-আদবী করিলে ঈমান হারা হইয়া অপমৃত্যু হওয়ারও আশংকা রহিয়াছে। ঐ সব বুজুর্গানের প্রতি দুর্ব্যবহার করার আগে তার মৃত্যু হওয়াই শ্রেয়ঃ ।

কোরান এবং হাদীছে খুব সুক্ষ্মভাবে চিন্তা ফিকির করিলে ইহা পরিস্কার হইয়া যায় যে, যার মধ্যে তায়াক্কুলের শর্তাবলী বিদ্যমান আছে তাহার জন্য তায়াক্কুল করা রুজী রোজগারে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে অনেক বেশী উত্তম। বরং ইহা অলী হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মোকাম। প্রিয় হাবীব

মোহাম্মদ (ছঃ) স্বয়ং তাওয়াক্কুল করনেওয়ালা ছিলেন, আর তাওয়াক্কুলের দ্বারা যে আমদানী হয় তাহা হাতের উপার্জন হইতে অনেক বেশী উত্তম। ইহাতে অনেক বরকত এবং বিশেষ নূর রহিয়াছে, আল্লাহ পাক যাহাদিগকে অন্তর চক্ষু দান করিয়াছেন তাহারা উহা স্বচক্ষে দেখিতে পান। এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা অন্য কোথাও করা হইবে, এতটুকু বুঝিয়া লওয়াই যথেষ্ট যে, বুজুর্গানে দ্বীনের প্রতি এইরূপ কটুক্তি করা গুরুতর অন্যায়। কত বড় অবিচারের কথা; নিজেত নেক কাজ করিবে না অথচ অন্যে করিলেও আজে-বাজে প্রলাপ বকিতে থাকিবে, ধিক তোমায়। আল্লাহ্কে কি করিয়া মুখ দেখাইবে যখন তাঁহার বন্ধুগণের পিছনে পড়িয়াছ?

উল্লেখিত উপকার ছাড়াও তাওয়াক্কুল এখ্তিয়ার করার মধ্যে বহু ধর্মীয় ফায়েদাও বিদ্যমান রহিয়াছে। যেই সমস্ত তাওয়াক্কুল ওয়ালা আল্লাহ্র বান্দাদের শিক্ষকতার কাজে লিপ্ত থাকেন তাঁহাদের প্রয়োজন মিটিবার মত খেদমত করাও ফরজ। সুতরাং নজরানা হিসাবে স্বীয় হক আদায় করা কেন অন্যায় বলিয়া গণ্য হইবে? আর যাহারা তাওয়াক্কুল অর্থাৎ আল্লাহ্র উপর ভরসা করে না তাহারা ত ঝগড়া ফাছাদ করিয়া স্বীয় হক আদায় করিয়া লয়। অথচ মোতাওয়াক্কেলীন যারা তারাও বড় ভদ্রতা এবং মানুষের অনুনয় বিনয়ের পরেই আপন হক কবুল করিয়া থাকেন। এবং নজরানা ইত্যাদি কবুল করার মধ্যে যদি কোন প্রকার অপমান এবং অসম্মান জনক না হইয়া এবং লোভ লালসার বশবর্তী না হইয়া লওয়া হয়, বিশেষ করিয়া উহা ফেরত দিলে দাতার মনে যদি ব্যথার আশংকা থাকে তবে উহার মধ্যে ত মঙ্গলই থাকে।

প্রকৃত পক্ষে যাহারা সত্যিকার ভাবে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করিয়া থাকেন তাঁহারা অত্যন্ত সম্মানজনক রুজী প্রাপ্ত হন, যেহেতু তাঁহাদের নিয়ত এবং তাওয়াজ্জু একমাত্র আল্লাহ্র প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। মাখলুকের প্রতি তারা ভ্রুক্ষেপও করে না। বরং যাদের দৃষ্টি ও লালসা মাখলুকের মালের প্রতি হয় তাহারা ত দাগাবাজ মাত্র। এখানে তাহাদের কোন আলোচনা নাই। আমাদের আলোচনা ত হইতেছে ঐ সব বুজুর্গানের বিষয় যাহারা প্রকৃত আল্লাহ ওয়ালা এবং আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করনেওয়ালা।

কাহাকেও নিকৃষ্ট মনে করা বিশেষতঃ আল্লাহ্‌র খাছ বান্দাদিগকে মন্দ বলা কঠিন পাপ, ইহাতে সেই সব বুজুর্গনের কোন ক্ষতি হয় না বরং তাঁহাদের লাভই হইয়া থাকে। কেননা কেয়ামতের দিন যাহারা মন্দ বলে তাহাদের নেকীসমূহ উহারা প্রাপ্ত হইবে, আর মন্দ বলার দরুন দুনিয়া আখেরাতে তাহারা বরবাদ হইয়া যাইবে।

একটি কথা মনে রাখিবে; শরীয়তে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাওয়াক্কুলের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। যেহেতু উহার সাহস করা, উহার শর্তাবলী পুরা করা বহুত বড় কঠিন কাজ। এই জন্য ঐ পর্যায়ের মোতাওয়াক্কেল বুজুর্গ খুব কমই পাওয়া যায়, বরং নাই বলিলেই চলে। আবার সাধারণতঃ খুব বেশী ভাল জিনিস খুব কমই পাওয়া যায়। আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শোকরিয়া আদায় করিতেছি যে, সামান্য মনোযোগের দ্বারাই এই বিষয়টি অপূর্ব সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে। আল্লাহ পাক আমাকে এবং তোমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।।

(৩) হাদীছ–হুজুরে পাক (ছঃ) ফরমাইয়াছেন– "নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক পূত পবিত্র (অর্থাৎ যাবতীয় গুণে গুণান্বিত এবং যাবতীয় দোষ হইতে মুক্ত) কাজেই তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না।" অর্থাৎ তিনি একমাত্র হালাল মালই কবুল করিয়া থাকেন। তাঁহার দরবারে হারাম মাল মকবুল হয় না। বরং বহু ওলামায়ে কেরাম ফরমাইয়াছেন যে, হারাম মাল দান করিয়া ছওয়াবের আশা করা কুফরীর শামিল। এবং নিশ্চয় আল্লাহ পাক আম্বিয়ায়ে কেরামকে যেই সব বস্তুর হুকুম করিয়াছেন মোমেনদিগকেও সেই সব বস্তুর হুকুম করিয়াছেন। তিনি ফরমাইয়াছেন, হে রাসূলগণ! তোমরা পাক পবিত্র জিনিস ভক্ষণ কর এবং নেক আমল করিতে থাক। আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন–হে ঈমানদারগণ! তোমাদিগকে আমি যেই সব রিজিক দান করিয়াছি সেই সব পাক পবিত্র জিনিস তোমরা খাও এবং পান কর। অতঃপর নবীয়ে করীম (ছঃ) ঐ ব্যক্তির উল্লেখ করেন, যে লম্বা ছফর করে চাই তার ছফর হজ্বের জন্য হউক বা এলেম তলব করার জন্য হউক, ছফরের মেহনত পরিশ্রমের

দরুন সে ধূলি মাখা শরীরে পেরেশান অবস্থায় আকাশের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া আলাহ্র দরবারে মুনাজাত করিয়া বার বার ছুয়াল করিতে থাকে যে, হে খোদা! তুমি আমার প্রতি করুণা কর ও আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। অথচ তাহার খাবার হারাম, পরণের কাপড় হারাম, অর্থাৎ তাহার পানাহার ও পোশাক পরিচ্ছদ সব কিছু হারাম তরীকায় হাছেল করা হইয়াছে ও সে হারামের মালে প্রতিপালিত হইয়াছে। হ্যাঁ যে নাবালেগ অবস্থায় মাতাপিতা কর্তৃক হারাম মাল দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছে আর বালেগ হওয়ার পর সে হালাল মাল উপার্জন করিয়া জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছে, সেই ব্যক্তি এই হুকুমের বাহিরে। কেননা, নাবালেগ অবস্থায় যাবতীয় পাপ মাতাপিতার উপর বর্তায়। ঐ ব্যক্তির দোয়া কি করিয়া কবুল হইবে? অর্থাৎ এত বেশী মেহনত করা সত্ত্বেও হারাম মাল ব্যবহারের দরুন তাহার দোয়া কখনও কবুল হয় না, আর যদি কখনও কখনও তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়া যায় তবে উহা তাহার দোয়া কবুল হওয়ার বিনিময়ে নয় বরং উহা হাছেল হওয়া তাহার পূর্ব নির্দ্ধারিত তক্বদীরেই ছিল। যেমন কোন কোন সময় কাফেরেরও মকছুদ পুরা হইয়া যায়।

বস্তুতঃ দোয়া কবুল হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ পাক বান্দার প্রতি রহমতের দৃষ্টি বর্ষণ করেন আর সেই রহমতের দরুণ তাহার আকাংখিত বস্তু দান করেন আবার সেই তলব করার নিমিত্ত তাহাকে ছওয়াব ও বখশিশ করেন, সুতরাং ইহা ঐ ব্যক্তি অর্জন করিতে পারে যে শরীয়তের বিধান মান্য করিয়া চলে ও যা চাওয়ার তা আল্লাহ্র নিকটই কামনা করে।

হাদীছের বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল যে, হালাল মাল খাওয়ার মধ্যে বড়ই বরকত রহিয়াছে, এবং এইরূপ মাল আহার করিলে নেক আমলের শক্তি বাড়ে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ আক্বলের তাবেদারী করে। হজরত আবু হামেদ মোহাম্মদ গাজালী (রহঃ) একজন বিখ্যাত দরবেশ হজরত ছুহায়েল (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি হারাম মাল ভক্ষণ করে তাহার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আক্বলের তাবেদারী ছাড়িয়া দেয়, অর্থাৎ তার বিবেক

তাকে নেক কাজ করার নির্দেশ দেয় কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো সেই নির্দেশ মোতাবেক কাজ করে না। তবে এইসব তথ্য ঐ সমস্ত বুজুর্গানের জানা আছে যাঁহাদের অন্তর চক্ষু আলোকিত। নতুবা যাহাদের অন্তর কালো হইয়া গিয়াছে তাহারাতো দিবারাত্রি লজ্জতের সামগ্রীতেই মত্ত থাকে। আল্লাহ পাক অন্তরের চক্ষু ও কলবের নূর দান করুন। আমীন!

(৪) হাদীছ–হজরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক (রহঃ) যিনি বিখ্যাত আলেম, বুজুর্গ এবং ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর শাগরেদ ছিলেন, বলিতেছেন, একটি সন্দেহজনক টাকা ফিরাইয়া দেওয়া (যদিও সেই টাকা আমার নিকট হাদিয়া স্বরূপ আসিয়া থকুক বা অন্য কোন প্রকারে) আমার নিকট ছয় লক্ষ টাকা দান করিয়া দেওয়া হইতেও অধিকতর প্রিয়। ইহা হইতেই অনুমান করা যায়, তাঁহাদের নিকট সন্দেহজনক মালের কতটুকু মূল্য ছিল। আফ্ছোছ বর্তমানে মানুষ পরিস্কার হারাম মালকেও পরিহার করে না, টাকা যে ভাবেই পাওয়া যায় উহাকেই গ্রহণ করিয়া থাকে। অথচ বুজুর্গানে দ্বীন সন্দেহজনক মালকেও কত বেশী খারাপ মনে করিতেন। হারাম মাল হইতে বাঁচিয়া থাকা প্রত্যেক মানুষের জন্যই জরুরী, এ ব্যাপারে অনেক বেশী সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। খারাপ এবং নাজায়েয মাল ভক্ষণ করিলে নফ্ছের মধ্যে অসংখ্য অনিষ্টের সৃষ্টি হয় যাহা মানুষকে ধ্বংস করিয়া ছাড়ে।

(৫) হাদীছ– প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, "হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট, আর এ দুইয়ের মাঝখানে রহিয়াছে কতিপয় সন্দেহযুক্ত বস্তু।"

অর্থাৎ ঐ সব বস্তুর হালাল অথবা হারাম হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে। একদিক চিন্তা করিলে মনে হয় হালাল আর অন্যদিক চিন্তা করিলে মনে হয় হারাম। বহু সংখ্যক লোক তাহা অবগত নহে। যাহারা অবগত আছেন তাহারা সংখ্যায় খুবই নগণ্য, তাহারা ঐ সমস্ত বড় বড় পরহেজগার মোত্তাকী আলেম যাহারা নিজের এলেম অনুযায়ী আমল করিয়া থাকেন। সুতরাং যে সন্দেহজনক বস্তু হইতে নিজকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে সে নিজের ধর্মকে রক্ষা করিয়াছে অর্থাৎ দোজখের আজাব হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, এবং অপবাদ দানকারীদের অপবাদ হইতে নিজের মান ইজ্জতকে রক্ষা করিয়াছে, কেননা কাজ– করিলে লোকে

মন্দ বলিয়া থাকে। আর ইহকাল ও পরকালের বে-ইজ্জতী হইতে আত্মরক্ষা করা প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাজ। পক্ষান্তরে যে সন্দেহজনক বস্তুতে লিপ্ত সে ক্রমাগত হারামের মধ্যে নিপতিত হয়। যেখানেই নফ্‌ছকে সামান্য-টুকু সুযোগ দেওয়া হয় তবে আর রক্ষা নাই, নফ্‌ছ এমন সব কর্মকান্ড করিয়া বসে যে, অবশেষে তাহার ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং যে ব্যক্তি ধন-দৌলত উপার্জনের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন না করে যাহাই আসে বা যাহাই পায় তাহাই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিতে থাকে, অচিরেই সে হারাম খাইতে শুরু করিবে। নফ্‌ছকে সব সময় শরীয়তের গন্ডীর ভিতর কয়েদ করিয়া রাখিবে, কখনও আজাদ ভাবে ছাড়িয়া দিবে না। আর যদিও এমন কোন সন্দেহ যুক্ত মাল ব্যবহার করা জায়েয যাহার সম্পর্কে পূর্ণভাবে ওয়াকেফহাল নয় যে, ইহার কতটুকু হালাল আর কতটুকু হারাম, কিন্তু ইহা ব্যবহার করা মাকরূহ। এরূপ সন্দেহযুক্ত বস্তুতে লিপ্ত হইলে আস্তে আস্তে প্রকাশ্য হারামে লিপ্ত হওয়ারই আশংকা। সুতরাং প্রত্যেকেরেই উচিত সন্দেহজনক বস্তুকে যেন পরিহার করিয়া চলে, ইহাই হইল আসল উদ্দেশ্য এবং সাহসের কাজ। কথাটি ভাল করিয়া বুঝিয়া লও।

ব্যাপারটি এই ভাবেও উপলব্ধি করা চলে যেমন কোন রাখাল বাদশাহের কোন খাস চারণভুমির আশেপাশে নিজের পশু চরাইয়া বেড়ায়, এমতাবস্থায় রাখালের সেই নিষিদ্ধ চারণভুমিতে ঢুকিয়া পড়া কোন বিচিত্র নয়। নফ্‌ছও ঠিক তেমনই কখনও প্রথম অবস্থাতেই সন্দেহযুক্ত বস্তু হইতে হারামে লিপ্ত হইয়া পড়ে আবার কখনও কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হারামে গ্রেপ্তার হইয়া যায়।

মাছ-আলা - "স্মরণ রাখিবে, যেই সমস্ত ঘাস কোন প্রকার তদবীর তদারক ব্যতীত আপনা আপনি জন্মিয়া থাকে সেইরূপ ঘাসগুলো তৃণভুমি (আপন পশুর জন্য খাছ করিয়া লওয়া এবং উহাতে অন্যাকে পশু চারণ করিতে নিষেধ করা কৃষকের জন্য নাজায়েজ)"।

মনে রাখিবে প্রত্যেক বাদশার জন্য একটা খাছ চারণ ভুমি অর্থাৎ সংরক্ষিত এলাকা রহিয়াছে। সাবধান! এই দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের

সংরক্ষিত এলাকা হইল তাহার নিষিদ্ধ হারাম বস্তু ও হুকুম সমূহ। যাহারাই ঐসব নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হইল তাহারাই আল্লাহ্র খেয়ানত করিল, আর বাদশাহের আমানতে খেয়ানত করা প্রকাশ্য বিদ্রোহ। এবং যেহেতু আল্লাহ পাক সর্বশ্রেষ্ঠ বাদশাহ, অতএব তাঁহার আমানতে খেয়ানত করা হইবে সর্বোচ্চ বিদ্রোহ। যার জন্য সাজাও হইবে সর্বাধিক কঠিন।

মনে রাখিবে, মানুষের শরীরে একটি মাংসখন্ড রহিয়াছে উহা যখন সুস্থ থাকিবে (অর্থাৎ অদৃশ্য যে কোন প্রকার রোগমুক্ত থাকিবে) ইহাতে সমস্ত শরীরই তাহার রোগমুক্ত থাকিবে। আর উহা যখন অসুস্থ এবং খারাপ হইয়া পড়িবে সমস্ত শরীরই তখন অসুস্থ হইয়া পড়িবে। খুব মনে রাখিবে সেই মাংস খন্ড হইল মানুষের দিল, অর্থাৎ দিল হইল শরীরের বাদশাহ, সেই দিল বা ক্বলবের ঠিক থাকা নির্ভর করে আল্লাহ্র হুকুম পালনের উপর। পাপ করিলে ক্বলব মরিয়া যায়। মূল কথা হইল নেক কাজ সমূহ নির্ভর করে অন্তর সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন থাকার উপর, আর অন্তরের সুস্থতা ও পরিচ্ছন্নতার উপর হালাল রিজিকের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে, সুতরাং হালাল খাবারের ব্যবস্থার জন্য এই হাদীছে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে।

(৬) হাদীছ-প্রিয় মাহ্বুব নবীয়ে করীম (ছঃ) এরশাদ করেন-ইহুদী সম্প্রদায়কে আল্লাহ পাক ধ্বংস করুক, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের জন্য গরু এবং বকরির চর্বি হারাম করিয়াছেন কিন্তু তাহারা চর্বিকে গলাইয়া উহাকে বিক্রয় করিয়া খায়, অর্থাৎ চক্রান্ত এই করে যে, স্বয়ং চর্বিতো খায় না বরং উহা বিক্রি করিয়া বিক্রয়লব্ধ টাকা খায়, আর ইহাকে চর্বি খাওয়া মনে করে না অথচ উক্ত হুকুমের উদ্দেশ্য ছিল চর্বি হইতে যে কোন প্রকারে উপকৃত না হওয়া, উহা বিক্রি করিয়া মূল্য ব্যবহার করাও উক্ত হুকুমের মধ্যে শামিল ছিল। বর্তমানে বহু সুদখোর এইভাবে হিলা বাহানা করিয়া লয় যে, প্রকাশ্যেতো উহা সুদ মনে হয় না অথচ প্রকৃত পক্ষে উহা সুদের শামিল, আল্লাহ পাক আলেমুল গায়েব, সকলের নিয়ত সম্পর্কে তাঁহার জানা আছে। এইরূপ হিলা বাহানা করা কিছুতেই দূরস্ত নাই।

(৭) হাদীছ- হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন -এমন কথা হইতেই পারে না যে, কোন ব্যক্তি হারাম মাল উপার্জন করিবে এবং ছদকা করিবে ও আল্লাহ্‌র দরবারে উহা কবুল হইবে, এবং ইহাও হইতে পারে না যে, সেই মাল খরচ করিবে আর উহার মধ্যে কোন প্রকার বরকত হইবে। এইরূপ মাল ছাড়িয়া গেলে উহা তাহাকে জাহান্নামে পৌঁছাইয়া ছাড়িবে।

অর্থাৎ হারাম তরীকায় মাল উপার্জন জাহান্নামে পৌঁছাইয়া ছাড়িবে।

অর্থাৎ হারাম তরীকায় মাল উপার্জন করিয়া উহা ছদকা করিলে কবুল হইবে না, বরং কোন কোন আলেমের মতে হারাম মাল ছদকা করিয়া ছওয়াবের নিয়ত করা কুফ্‌রী, আর যেই ফকীরকে দান করা হইয়াছে সে যদি জানে যে, দাতা ছওয়াবের নিয়তে দান করিয়াছে তবে দাতার জন্য দোয়া করিলেও সে ফকীর কাফের হইয়া যাইবে। আর যদি এমন মাল কোন কাজে লাগানো হয় তবে সেই কাজে কোন প্রকার বরকত হয় না। আবার যদি মরিয়া যাইবার সময় এইরূপ হারাম মাল ছাড়িয়া যায় তবে উহা তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া ছাড়িবে। খাইবে তো উত্তরাধিকারীরা অথচ তাহাকে জাহন্নামে নিক্ষেপ করিয়া ছাড়িবে। খাইবে তো উত্তরাধিকারীরা অথচ জাহন্নামের আজাব ভোগ করিবে সে নিজে।

মূলকথা হারাম মালে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নাই। কেননা আল্লাহ পাক অন্যায়কে অন্যায়ের দ্বারা দূর করেন না। সুতরাং হারাম যখন ছদকা করাই হারাম, তখন উহার দ্বারা গুনাহ্‌ মাফ হইতে পারে না, হ্যাঁ তিনি অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা করিয়া থাকেন। অতএব হালাল মাল ছদকা করিলে উহা পাপ সমূহকে মিটাইয়া দেয়। তবে শর্ত হইল উহাও যদি শরীয়ত মোতাবেক ছদকা করা হয়।

(৮) হাদীছ - হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন যেই মাংসখন্ড হারাম মাল দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছে বা বর্দ্ধিত হইয়াছে উহা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না আর হারাম মালে প্রতিপালিত গোশ্‌ত্‌ জাহান্নামেরই উপযোগী।

অর্থাৎ হারামখোর উপযুক্ত সাজা ভোগ করার পূর্বে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অর্থ এই নয় যে, কাফেরদের মত কখনও জান্নাতে যাইবে না বরং যদি সে হারাম মাল খাওয়া সত্ত্বেও ইছলামের উপর

মৃত্যুবরণ করিয়াছে তবে সে নিজ কৃতকর্মের সাজা ভোগ করিয়া নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করিবে, আর যদি হারাম খাইয়া তওবা করিয়া মারা যায় তবে আল্লাহ তায়ালা গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। আর এই হাদীছে বর্ণিত আজাব হইতেও মাহফুজ থাকিবে।

(৯) হাদীছ–হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, মানুষ ঐ পর্যন্ত প্রকৃত পরহেজগার হইতে পারিবে না যেই পর্যন্ত সন্দেহজনক বস্তুকে ত্যাগ না করিবে। যেমন কোন জিনিস একেবারেই হালাল, আবার কোন জিনিস মুবাহ বা জায়েয, কিন্তু এই মুবাহ কাজে লিপ্ত হইলে যে কোন প্রকার নাজায়েজ কাজে গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, এমতাবস্থায় এই জায়েয কাজও করিবে না। কেননা উহা দ্বারা অন্য কোন গোনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যেহেতু শরীয়তের বিধান মোতাবেক যাহা গোনাহের কারণ হইয়া দাঁড়ায় উহা করাও গোনাহ। যেমন ভাল ভাল খাদ্য সামগ্রী এবং পোশাক পরিচ্ছদে লিপ্ত হওয়া জায়েয, কিন্তু উহা সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে পাপে লিপ্ত হওয়ার আশংকা রহিয়াছে। এইজন্য উঁচু দরজার পরহেজগারী হইলে এইরূপ কাজকর্ম হইতেও বাঁচিয়া থাকিবে। অথবা যেমন সন্দেহজনক বস্তু ভক্ষণ করা মাকরূহ, কিন্তু উহা ব্যবহার করা আরম্ভ করিলে ভয় রহিয়াছে যে, নফছ আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়া হারাম খাওয়া আরম্ভ করিবে, এমতাবস্থায় এইরূপ মাকরূহ জিনিস হইতেও বাঁচিয়া থাকিবে।

(১০) হাদীছ–আম্মাজান হজরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) এর একজন গোলাম ছিল, যে হজরত আবু বকর (রাঃ) কে খাজনা দিত, অর্থাৎ গোলামের উপার্জিত সম্পদ হইতে তাঁহাকে একটা অংশ খাজনা স্বরূপ আদায় করিত। গোলামের আদায়কৃত মাল হজরত ছিদ্দীকে আকবর খাইতেন। একদিন সেই গোলাম কিছুটা খাওয়ার জিনিস আনিয়া হজরত আবু বকরকে দিল, তিনি সেখান হইতে কিছু খাইয়া ফেলিলেন, গোলাম বলিল, আপনার কি জানা আছে যাহা খাইলেন উহা কি জিনিস ? হজরত আবু বকর (রাঃ)

বলিলেন, তুমি কি জিনিস খাওয়াইলে? সে উত্তর করিল, আমি কুফুরী অবস্থায় জনৈক ব্যক্তিকে গণকদের তরীকায় না জানা সত্ত্বেও কিছু গায়েবী কথা বাত্‌লা ইয়াছিলাম, সেই কথার বদলে এই মাল পাইয়াছি । ইহা শুনিবা মাত্রই হজরত আবু বকর ছিদ্দীক গলার ভিতর হাত ঢুকাইয়া দিয়া পেটের যাবতীয় খাদ্য বমি করিয়া ফেলিয়া দিলেন। ইহাকেই বলে প্রকৃত পরহেজগারী, কেননা তিনি যদি বমি করিয়া নাও ফেলিতেন তবুও কোন গোনাহ্ হইত না।

(১১) হাদীছ–বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি দশ টাকা দিয়া এক খানা কাপড় খরিদ করিল উহার মধ্যে যদি একটি টাকাও হারামের থাকে তবে যতদিন পর্যন্ত এ কাপড় তাহার পরিধানে থাকিবে আল্লাহ পাক তাহার নামাজ কবুল করিবেন না, অর্থাৎ যদিও তাহার ফরজ আদায় হইবে কিন্তু নামাজের পুরা ছওয়াব সে পাইবে না, এই ভাবে অন্যান্য আমলকেও অনু– ধাবন করিয়া লইবে। আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা উচিত, প্রতমতঃ মানুষ এবাদতই বা

কি করিয়া থাকে আর যদি কিছু করিয়াও থাকে তবে উহা এই ভাবে বরবাদ হইয়া যায়, অতঃপর কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে কি জবাব দেওয়া যাইবে আর কঠিন আজাবও বা কিভাবে সহ্য করা হইবে?

(১২) হাদীছ– হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন, নিশ্চয় আমার জানা যাবতীয় বস্তু যাহা তোমাদিগকে বেহেশ্‌তের নিকটবর্তী করিয়া দিবে ও দোজখ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবে সব কিছুই আমি বলিয়া দিয়াছি। অর্থাৎ যেই সব আমল জান্নাতে পৌছাইয়া দিবে ও জাহান্নাম হইতে দূরে রাখিবে উহার সব কয়টাই আমি তোমাদিগকে বাত্‌লাইয়া দিয়াছি। আর আমার জানা ঐ সব আমাল যাহা তোমাদিগকে বেহেশ্‌ত হইতে দূরে রাখিবে ও দোজখের নিকটবর্তী করিয়া দিবে উহার সবকয়টি হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছি এবং হজরত জিব্রাঈল (আঃ) আমার অন্তরে এই কথা জাগরিত করিয়া গেলেন যে, নিশ্চয় প্রত্যেক নফ্‌ছের তাকদ্বীরে যতটুকু রিজিক লিপিবদ্ধ রহিয়াছে উহা গ্রহণ করার পূর্বে সে

মরিতে পারিবে না। যেই সময়ের জন্য উহা লিখিত হইয়াছে দেরিতে হই-লেও ঠিক সেই সময় উহা পৌছিয়া যাইবে। নিয়ত খারাপ করিলে বা হারামের পিছনে পড়িলে তাড়াতাড়ি আসিবে না। আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তাহার উপর ভরসা রাখ এবং তাঁহার ওয়াদার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখ। সুতরাং হারাম উপার্জন হইতে বাঁচিয়া থাক এবং জীবিকার তালাশকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত কর, অর্থাৎ উপার্জনে অতিমাত্রায় লিপ্ত হইও না, লোভ লালসা করিও না, শরীয়তের খেলাফ অবৈধ উপার্জন হইতে বাঁচিয়া থাক। সাবধান! রুজী পৌছিতে দেরী হইলে কখনও আল্লাহ্‌র না ফরমানী করিয়া জীবিকা উপার্জনে লাগিয়া যাইও না। কেননা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তাহা কখনও আসিবে না। অযথা লজ্জতহীন পাপে গ্রেপ্তার হইবে, কেননা আল্লাহ পাকের নাফরমানী করিয়া তাঁহার নিকট হইতে রিজিক হাছেল করা তাঁহার শানের খেলাফ।

(১৩) হাদীছ – হুজুর পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, জীবিকার দশ ভাগের নয় ভাগ তেজারতের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, অর্থাৎ ব্যবসা আমদানীর বিরাট একটা মাধ্যম, কাজেই উহাকে তোমরা অবলম্বন কর।

(১৪) হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাক ঐ মোমেনকে ভালবাসেন যে কোন প্রকার ব্যবসা বাণিজ্য করে এবং পরিশ্রম করে, এমন কি সে কি রকম কাপড় পরিধান করে উহার প্রতিও তাহার লক্ষ্য নাই, অর্থাৎ পরিশ্রমের দরুন সাধারণ ময়লা যুক্ত কাপড় চোপড় পরিধান করে। কাপড় পরিষ্কার করিবার সময়–সুযোগও পায় না। তবে যাহারা খুব বেশী অপারগ নয় তাহাদের জন্য সরলতার ভিতর দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত।

(১৫) হাদীছ– প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, আমার নিকট এইরূপ অহী পাঠান হয় নাই যে, আমি মাল জমা করি এবং ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হই, বরং এই কথার অহী করা হইয়াছে যে, আমি যেন আল্লাহ তায়ালার প্রশংসার সহিত তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করি অর্থাৎ ছোব্‌হানাল্লাহে অবিহা –মদিহী যেন পাঠ করিতে থাকি এবং বলা হইয়াছে যে, তুমি নামাজীদের

অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাও, আর আল্লাহ্র এবাদতে লিপ্ত হইয়া থাক মৃত্যু আসার পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুনিয়াতে লিপ্ত হইও না, কেননা প্রয়োজন মোতাবেক জীবিকার ব্যবস্থা করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজেব। হ্যাঁ যাহার মধ্যে তাওয়াক্কুলের শক্তি রহিয়াছে ও তাহার মধ্যে উহার যাবতীয় শর্তাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে এমন ব্যক্তি যাবতীয় কাজকর্ম ছাড়িয়া শুধু মাত্র জ্ঞান চর্চ্চায় ও এবাদতে মশগুল হইতে পারে।

(১৬) হাদীছ– হজরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন– আল্লাহ পাক রহমত বর্ষণ করেন ঐ ব্যক্তির উপর যে নম্র ব্যবহার করিয়া থাকে বেচাবিক্রির সময় অথবা নিজ পাওনা চাহিবার সময়। ছোবহানাল্লাহ! কেনা–কাটা এবং স্বীয় পাওনা উসূল করার ব্যাপারেও যে ব্যক্তি নম্র বা ভদ্র ব্যবহার করে স্বয়ং নবীয়ে করীম (ছঃ) তাঁহার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিতেছেন। হুজুরে পাকের দোয়া নিশ্চিতভাবে মাকবুল। এরূপ বিনয়ের বিনিময়ে যদি অন্য কোন ছওয়াব নাও হইত তবুও প্রিয় নবীর দোয়াই যথেষ্ট ছিল। অথচ এই নম্রতার পরিবর্তে ছওয়াবও মিলিবে। সুতরাং ব্যবসায়ীদের জন্য জরুরী তাহারা যেন এই ছহী হাদীছের উপর আমল করিয়া হুজুরে পাক (ছঃ) এর দোয়ার অংশীদার হন। তদুপরি দুনিয়াতে এইরূপ অপূর্ব আচরণের ফায়েদা এই যে, এমন ব্যক্তির উপর লোকজন খুব সন্তুষ্ট থাকে ও তাহার ব্যবসা বেশ চালু হয়। মানুষ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং অনেক সময় তাহার জন্য সন্তুষ্ট চিত্তে দোয়াও করিয়া থাকে।

প্রকৃত কথা এই যে, শরীয়তের উপর আমল করিয়া চলিলে মানুষ দ্বীন ও দুনিয়ার বাদশা বনিয়া যায়, এবং এক আনন্দময় জীবন যাপন করিতে পারে। ঐ ব্যক্তি হইতে ভাগ্যবান আর কে হইতে পারে যে উভয় জাহানের বরকতসমূহ হাছেল করিয়া নেয় এবং আল্লাহ্র নিকট ও অধিকাংশ মানুষের নিকট মাহ্বুব ও প্রিয়জনে পরিণত হয়।

(১৭) হাদীছ – প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, তোমরা বিক্রয়ের সময় বেশী বেশী কছম খাওয়া হইতে বিরত থাক। অর্থাৎ মাল অধিক কাটতি হইবার জন্য ঘন ঘন কছম খাইওনা, কেননা অধিক কছমের

দরুন হয়ত মুখ হইতে কোন মিথ্যা কছম বাহির হইয়া পড়িবে, যদ্দরুন মালের মধ্যে বেবরকত আসিয়া যাইবে এবং আল্লাহ্‌র নামের সহিত বেআদবী হইয়া যাইবে। তবে কোন কোন সময় মালের অধিকতর গুরুত্ব অনুধাবন করাইবার জন্য কছম করার মধ্যে কোন দোষ নাই।

(১৮) হাদীছ– প্রিয় মাহ্‌বুব নবীয়ে করীম (ছঃ) এরশাদ করেন – মহা সত্যবাদী ব্যবসায়ী আর মহা আমানতদার কারবারী কেয়ামতের দিন আম্বিয়ায়ে কেরাম, ছিদ্দীক্বীন ও শহীদানে কেরামের সাথী হইবে। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ তায়ালার বিখ্যাত অলী এবং যাহারা প্রত্যেক কথায় ও কাজে সর্বোচ্চ দরজার সততা এখ্‌তিয়ার করিয়াছে এবং খোদাওন্দ করীমের যথাসাধ্য এবাদত বন্দেগী করিয়াছে। তাহারা রোজ কেয়ামতে আম্বিয়া, ছিদ্দীক্বীন ও শহীদানে কেরামের সাহচর্য লাভ করিয়া দোজখ হইতে নাজাত পাইয়া বেহেশ্‌তবাসী হইবে।

মনে রাখিবে, সাথী হওয়ার এই অর্থ নয় যে, যাবতীয় মর্যাদায় তাঁহাদের সমকক্ষ হইবে বরং ইহার অর্থ হইল বিশেষ একটা বুজুর্গী যাহা বড়দের সাথে থাকিলে হাছেল হয়। যেমন কোন ব্যক্তি যে কোন বুজুর্গ ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিল এবং হুজুরের সাথে তাঁহার খাদেমগণকে দাওয়াত করিল। এখন একথা সর্বজনবিদিত যে, বুজুর্গ এবং তাঁহার খাদেমদের বসার স্থান, খাবারের টেবিল; খাদ্য সামগ্রী সব কিছু একই প্রকার হইবে কিন্তু আমন্ত্রণকারীর দৃষ্টিতে বুজুর্গের সম্মান আর খাদেমগণের সম্মান কখনও এক হইবে না। হ্যাঁ সাহচর্যের বুজুর্গী, খাওয়া এবং বসার মধ্যে সমতা ইহাও কম মর্যাদার কথা নয়। বিশেষতঃ প্রিয় মাহবুব নবী হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) এর সাথী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করা কত বড় দৌলত। যদি মনে কর যে, সাথে থাকিলে কোন খাওয়া পাওয়া গেল না, সাহচর্যের অধিক কোন মর্যাদাও দেওয়া হইল না, তবু শুধুমাত্র প্রিয় নবীর ছোহবত প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার দীদার লাভ হওয়া বহুত বড় দৌলত। বরং দীদার ত বড় জিনিস তদুপরি হুজুরের প্রতিবেশী হওয়াটাও একটা বিরাট নেয়ামত সুতরাং মুছলমানদিগকে প্রিয় হাবীবের উল্লেখিত দোয়ার উপযুক্ত হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত।

(১৯) হাদীছ- প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! নিশ্চয় বেচাবিক্রি এমন এক বস্তু যাহার মধ্যে অনর্থক কথাবার্তা এবং বৃথা কছম হইয়াই যায়, কাজেই উহার সহিত ছদকা মিলাইয়া লও।" অর্থাৎ আজে বাজে কথাবার্তা এবং বেহুদা কছম খাওয়া বড় অন্যায় কথা। সুতরাং কিছু কিছু ছদকা করিয়া দিলে অনিচ্ছাকৃত অযথা বাক্য সমূহের পাপ ও অন্তরে যে সব কালিমা পয়দা হয় ঐ সবের কাফ্‌ফারা হইয়া যায়।

(২০) হাদীছ-একটি হাদীছে বর্ণিত আছে কেয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদিগকে ফাছেক ফাজের এবং গোনাহগার হিসাবে উঠানো হইবে। তবে উহারা নয় যাহারা আল্লাহকে ভয় করিয়াছে এবং সত্য কথা বলিয়াছে। অর্থাৎ যাহারা কেনাকাটায় কোন গোনাহের কাজ করে নাই তাহারা ঐ বিপদ হইতে বাঁচিয়া যাইবে।

পরিচ্ছেদ
উপার্জনের ফজীলত সম্পর্কে বর্ণনা

এই পরিচ্ছেদে প্রথমে কোরানে পাকের কিছু আয়াত বর্ণনা করা যাইতেছে। ইমাম গাজালী (রহঃ) এহ্‌ইয়াউল উলূম গ্রন্থের "আছাবুল কাছ্‌বে অল মায়াশ" অধ্যায়ে এবিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। উহা হইতে সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে লিখিতেছি। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

"এবং আমি দিনকে জীবিকা উপার্জনের জন্য বানাইয়াছি।" -ছুরে 'নাবা' মানুষের উপর যে আল্লাহ পাকের অফুরন্ত এহ্‌ছান উহা প্রকাশ করার জন্য তিনি এই আয়াত বয়ান করিয়াছেন। অন্য আয়াতে এরশাদ ফরমাইতেছেন।

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ

"এবং আমি তোমাদিগকে জমীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, এবং তোমাদের জন্য উহার মধ্যে জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছি। অথচ তোমরা শোকর গোজারী বহুত কমই করিয়া থাক।" (ছুরা আ'রাফ)

অন্য জায়গায় এরশাদ করেন –

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

"আর বহু সংখ্যক লোক জমীনের উপর চলাফেরা করে, তাহারা খোদা প্রদত্ত রিজিক তালাশ করিয়া থাকে।" (ছুরা মোজাম্মেল)

অন্য একস্থানে ফরমাইতেছেন –

فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

"অতঃপর তোমরা জমীনে ছাড়াইয়া পড় এবং আল্লহ্‌র দান রিজিক তালাশ করিতে থাক।"

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে –

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

رَوَاهُ الطِّبْرَانِى -

অর্থঃ– হজরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, হালাল মাল তালাশ করা প্রত্যেক মুছলমানের উপর ওয়াজেব। (তিবরানী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

رَوَاهُ الطِّبْرَانِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ -

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাছউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, হালাল মাল উপার্জন করা অন্যান্য ফরজ আদায়ের পর পরবর্তী ফরজ। (তিবরানী, বায়হকী)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ اكْتَسَبَ مَالاً مِنْ حَلَالٍ فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ أَوْ كَسَاهَا فَمَنْ دُونَهُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ لَهُ زَكَاةً

(ابن حبان)

হজরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) হুজুরে পাক (ছঃ) হইতে বর্ণনা করেন, যেই ব্যক্তি হালাল মাল উপার্জন করিয়া নিজ খাওয়া এবং পরায় ব্যয় করিয়াছে অথবা আল্লাহ্র অন্য কোন মাখলুককে খাওয়াইয়াছে বা পরাইয়াছে তবে ইহা তাহার জন্য ছদকার মধ্যে গণ্য হইবে।

عَنْ رَكْبِ الْمِصْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوبَى لِمَنْ طَابَ كَسْبُهُ - رواه الطبرانى

হজরত রকব মিছরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যাহার উপার্জন পাক পবিত্র। (তিবরানী)

তারগীব ও তারহীব গ্রন্থে একটি লম্বা হাদীছ বণিত আছে, হজরত ছায়াদ বিন আবি অক্কাছ আরজ করিয়াছিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ্! আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক আমাকে ‘মোস্তাজাবুদ্দাওয়াত” বানাইয়া দেন। প্রিয় নবী উত্তর দিলেন, হে ছায়াদ! নিজের খাদ্য সামগ্রীকে পাক পবিত্র করিয়া লও তবে তুমি মোস্তাজাবুদ্দাওয়াত বনিয়া যাইবে। অর্থাৎ

তোমার যাবতীয় দোয়া কবুল হইয়া যাইবে। হুজুর (ছঃ) আরও এরশাদ করেন, ঐ জাতে পাকের কছম যাঁহার কুদরতী হাতে আমার জান রহিয়াছে বান্দা যখন কোন হারাম লোকমা আপন উদরে প্রবেশ করায় তখন চল্লিশ দিন যাবত তাহার কোন আমল কবুল হয় না।

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يْكَرِبَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَاكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَاِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ - بخارى

হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন, নিজ হাতের উপার্জনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর খানা কেহ কখনও খায় নাই। এবং আল্লাহ্‌র নবী হজরত দাউদ (আঃ) নিজ হাতে উপার্জন করিয়া খাইতেন। (বোখারী)

অন্য হাদীছে বর্ণিত আছে, হুজুর (ছঃ) বলেন, নিজ হাতের উপার্জনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন উপার্জন নাই আর যেই হালাল মাল মানুষ নিজের জন্য, পরিবার পরিজনের জন্য এবং চাকর নওকরের জন্য ব্যয় করে উহাও তাহার জন্য ছদকার মধ্যে গণ্য।

হজরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে, প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, মানুষ আপন পিঠে লাক্‌ড়ি বোঝাই করিয়া বিক্রি করিয়া খাইবে, ইহা তাহার জন্য কাহারও নিকট ছুয়াল করার চেয়ে অনেক ভাল, চাই সে তাহাকে দান করুক বা না করুক।

জনৈক ব্যক্তিকে হুজুর (ছঃ) উপার্জনের জন্য কুড়াল কিনে দিলেন

عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ اَتَى النَّبِيَّ (ص) فَسَاَلَهُ فَقَالَ اَمَا فِيْ بَيْتِكَ شَيْئٌ؟ قَالَ بَلٰى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ - الحديث

হুজরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা জনৈক আনছারী প্রিয় নবী হুজুরে পাক (ছঃ) এর খেদমতে আসিয়া কিছু মাল ছুয়াল করিল। হুজুর এরশাদ করিলেন, তোমার ঘরে কি কোন জিনিস নাই? সে আরজ করিল জী–হ্যাঁ আছে, একটা চট্ রহিয়াছে যাহার একাংশ আমি পরিধান করি ও অন্য অংশ বিছাইয়া আমি শয়ন করিয়া থাকি আর একটি পেয়ালা আছে উহা দ্বারা আমি পানি পান করি। হুজুর (ছঃ) বলিলেন, উভয় বস্তু আমার নিকট নিয়া আস আনছারী হুকুম মোতাবেক নিয়া আসিল। প্রিয় হাবীব (ছঃ) দুইটা জিনিস হাতে লইয়া এরশাদ করিলেন, এই মাল কে খরিদ করিবে? এক ছাহাবী উঠিয়া বলিল হুজুর! আমি এক দেরহামে খরিদ করিব, হুজুর বলিলেন, এক দেরহামের বেশী দিয়া কে খরিদ করিবে? হুজুর (ছঃ) এই ভাবে দুই তিন বার বলার পর জনৈক ছাহাবী উঠিয়া বলিল, আমি দুই দেরহামে নিবার জন্য প্রস্তুত। হুজুরে পাক (ছঃ) দুইটা দেরহাম আনছারীর হাতে দিয়ে ফরমাইলেন, এক দেরহামের কিছু খাবার কিনিয়া বিবির নিকট ফেলিয়া আস, আর অন্য দেরহাম দিয়া একটি কুড়াল কিনিয়া আমার নিকট নিয়া আস। ছাহাবী কুড়াল নিয়া আসিল ও হুজুরে আকরাম (ছঃ) আপন হাত মোবারকের দ্বারা ঐ কুড়ালে কাঠ লাগাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যাও ইহা দ্বারা কাঠ কাটিয়া বিক্রি করিতে থাক। মনে রাখিবে আগামী পনের দিন যাবত যেন আমি তোমাকে দেখিতে না পাই। অতঃপর পনের দিন পর লোকটি প্রিয় নবীর খেদমতে হাজির হইল তখন তাহার মুনাফা বাবত দশ দেরহাম জমা ছিল। তখন প্রিয় মাহবুব (ছঃ) এরশাদ করেন, নিজ হাতে উপার্জন করা তোমার জন্য উহা হইতে উত্তম যে কেয়ামতের দিবস এই অবস্থায় আসিবে যে, তোমার মুখ মন্ডলে ছুয়ালের দাগ বিদ্যমান থাকিবে। (তিরমিজি)

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَمْسٰى كَالًّا مِنْ عَمَلِهِ اَمسٰى مَغْفُورًا لَّهُ –

طبرانى

আম্মাজান হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি এই অবস্থায় সন্ধ্যা করিল যে কাজ করিতে করিতে সে একবার ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে তখন সে এমন অবস্থায় সন্ধ্যা করিল যেমন তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া গেল।

উল্লেখিত আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহ দ্বারা রোজগার ও উপার্জনের ফজীলত এবং উহার প্রতি উৎসাহ বুঝা যাইতেছে। ইহা ছাড়াও নিজ হাতে কামাই করার অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে। কিন্তু এসবের মোকাবেলায় তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে যেই সব আয়াত ও হাদীছ বর্ণিত আছে উহা আরও বেশী উঁচু ধরনের। কোরান হাদীছ এবং বুজুর্গানের বাণীসমূহ তাওয়াক্কুলের দ্বারা ভরপুর রহিয়াছে। ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন, দ্বীনের মর্যাদাসমুহের মধ্যে তাওয়াক্কুল একটা বড় ধরণের মর্যাদা। এবং যেই সব গুণাবলীর দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যায় উহার মধ্যে তাওয়াক্কুল শীর্ষ স্থানীয়, উহাকে বুঝাও বড় কঠিন এবং উহার উপর আমল করা আরও কঠিন। এই ব্যাপারে যেই সব হাদীছ কোরান বর্ণিত আছে উহার সংখ্যা নির্ণয় করাও মুশকিল। নিম্নে কিছু সংখ্যক বর্ণনা করা যাইতেছে।

আল্লাহ্ পাক বলেন –

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

"তোমরা যদি সত্যিকার মোমেন হও তবে একমাত্র আল্লাহ্র উপরই ভরসা কর।"

অন্য আয়াতে এরশাদ হইতেছে –

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ –

"এবং যাহারা ভরসা করিতে চায় তাহাদের একমাত্র আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা উচিত।"

অন্য জায়গায় আসিয়াছে –

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

"যে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিবে, আল্লাহ পাক তাহার জন্য যথেষ্ট।"
আরও একটি আয়াতে আসিয়াছে -

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

"যাহারা আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ পাক তাহাদিগকে ভালবাসেন।"

ফায়েদাঃ আল্লাহ তায়ালা যাহার জন্য যথেষ্ট হইয়া যান আর যাহাকে বন্ধু বানাইয়া লন সে নিশ্চয় কৃতকার্য হইয়া গিয়াছে, কেননা বন্ধুকে কেহ শাস্তিও দেয় না। এবং নিজ দর্শন হইতে প্রিয়জনকে বঞ্চিত ও করে না।
আর একটি আয়াতে এরশাদ হইতেছে -

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ -

অর্থ ঃ " আল্লাহ পাক কি স্বীয় বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?
অন্য একটি আয়াত -

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

অর্থঃ " যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিবে তবে আল্লাহ পাক জবরদস্ত হেকমত ওয়ালা।"
আরও এরশাদ হইতেছে -

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ

অর্থঃ "তোমরা যাহাদিগকে আল্লাহ ব্যতীত ডাকিতেছ তাহারা ত তোমাদের মতই বান্দা।" অনত্র আসিয়াছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا

فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ فَاعْبُدُوْهُ -

অর্থঃ "নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাহাদের উপাসনা করিতেছ তাহারা তোমাদের রিজিকের জিম্মাদার নয়। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকটই রিজিক তালাশ কর আর তাঁহারই উপাসনা কর।"

অন্য আয়াতে আসিয়াছে -

وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ

"আছমান এবং জমীনের যাবতীয় ভান্ডার আল্লাহ্‌র জন্যই। কিন্তু মোনাফেকগণ তা বুঝে না।"

অন্য এক জায়গায় এরশাদ ফরমাইতেছেন -

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهٖ -

"যাবতীয় কাজের তিনিই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাঁহার অনুমতি ভিন্ন কেহ কোন সুপারিশ করিতে পারেনা।" এই সব আয়াতে কারীমা ছাড়াও তাওয়াক্কুল সম্পর্কে হাদীছের কিতাবসমূহে অসংখ্যা হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে।

যেমন নবীয়ে করীম (ছঃ) এশাদ করিতেছেন -

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ(رض)قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْاُمَمُ-الحديث -

متفق عليه

হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাছ (রাঃ) এরশাদ করেন, একদিন রাছুলে আকরাম (ছঃ) ঘর হইতে বাহির হইলেন। অতঃপর প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, আমার উপর পূর্ববর্তী সমস্ত উম্মত পেশ করা হইল, তখন আমি দেখিতে পাইলাম, কোন নবীর সাথে একজন মাত্র উম্মত যাইতেছে যে তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিল। আবার কোন নবীর সহিত দুইজন

রহিয়াছে, এবং কোন নবীর সহিত একটি দল রহিয়াছে, আবার কোন কোন নবীর সহিত একটি মাত্র লোকও নাই। অতঃপর একটি বিরাট জমাত দেখিতে পাইলাম, তাহারা সংখ্যায় অধিক হওয়ার দরুণ মনে হইল যে আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তখন আমি মনে মনে আকাংখ্যা করিলাম ইহারা যেন আমার উম্মত হয়। আমাকে বলা হইল যে ইহারা হজরত মুছা (আঃ) এর উম্মত। অতঃপর আমাকে বলা হইল যে আপনি দৃষ্টি উঠান। আমি দৃষ্টি উঠাইবা মাত্রই একটি বিশাল জমাত দেখিতে পাইলাম, যাহারা আপন আধিক্যের দরুন যেমন সমস্ত আকাশকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তারপর আমাকে বলা হইল এদিক ওদিক অর্থাৎ ডানে বামে নজর করুন। আমি ডান বামে অনেক বড় জমাত দেখিতে পাইলাম। তাহারা সংখ্যায় এত বেশী ছিল যে, মনে হইল যে সমস্ত আকাশকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। তখন আমাকে বলা হইল যে, ইহারা আপনার উম্মত। ইহাদের অগ্রভাগে আরও সত্তর হাজার রহিয়াছে যাহারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা ফালনামার সাহায্যে কোন অশুভ চক্রের পিছনে পড়ে না এবং কোন প্রকার যাদু টোনা যুক্ত তাবিজাদিও ব্যবহার করেনা আর স্বাস্থ্যের জন্য শরীরে কোন দাগও লাগায়না। তাহারা শুধু আল্লাহর উপরই ভরসা করিয়া থাকে। এই কথা শুনিয়া হজরত ওকাশা বিন মেনছান উঠিয়া আরজ করিল, হুজুর! দোয়া করুণ আমি যেন ঐ সব অগ্রগামী লোকের দলভুক্ত হইতে পারি। হুজুর (ছঃ) দোয়া করিলেন, হে খোদা! তুমি ওকাশাকে উহাদের সাথী করিয়া নাও। ইত্যবসরে আরেক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, হুজুর, আমার জন্যও দোয়া করুন। প্রিয় নবী উত্তর করিলেন, ওকাশা প্রথমেই দোয়া পাইয়া গিয়াছে।

ওকাশা প্রথমেই দোয়া পাইয়া গিয়াছে, ইহার অর্থ এই যে, একটা হইল 'তলবে হাক্বীক্বী' প্রকৃত এরাদা আর অন্যটা হইল অন্যের অনুসরণ করিয়া এরাদা করা। যেমন পীরের হাতে বয়াত করিবার সময় কেহত পূর্ণ তলব ও আগ্রহ নিয়া আসে। আবার কেহ কেহ দেখাদেখি বয়াতে শরীক হইয়া যায় এবং বলে যে, আমিও মুরীদ হইয়া গিয়াছি।

হাদীছে কুদছীতে বর্ণিত আছে -

اِنَّ اللّٰهَ قَالَ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ وَعُلُوِّىْ وَبَهَائِىْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِىْ لَايُؤْثِرُ عَبْدٌ هَوَاىَ عَلٰى هَوَا نَفْسِهِ اِلَّا اُثْبِتُ اَجَلَهٗ عِنْدَ بَصَرِهٖ وَضَمَّنْتُ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ رِزْقَهٗ وَكُنْتُ لَهٗ مِنْ وَّرَاءِ تِجَارَةِ كُلِّ تَاجِرٍ - رواه الطبرانى

অর্থাৎ আল্লাহ পাক ফরমাইতেছেন আমার ইজ্জতের, আমার বুজুর্গীর, আমার উচ্চমর্যাদা, সৌন্দর্য এবং উচ্চাসনের কছম, কোন বান্দা যখন তাহার খাহেশাতকে আমার খাহেশাতের উপর প্রাধান্য না দেয়, আমি তখন তাহার মৃত্যুকে তাহার দৃষ্টির সামনে করিয়া লই। অর্থাৎ মওতের স্মরণ হইতে সে কখনও গাফেল থাকেনা, এবং আছমান ও জমীনকে তাহার রিজিকের জিম্মাদার বানাইয়া দেই, এবং আমি প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পিছনে তাহার জন্য সাহায্যকারী বনিয়া যাই। অর্থাৎ সে যেই ব্যবসায়ী হইতেই মাল খরিদ করুক না কেন তাহার যথেষ্ট মুনাফা অর্জন হয়। (তিবরানী)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَّتَرُوْحُ بِطَانًا - ترمذى ابن ماجة

হজরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমি প্রিয় হাবীব হুজুরে পাক (ছঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর যথোপযুক্ত তাওয়াক্কুল করিতে পার তবে তোমাদিগকে পাখীর মত রিজিক দান করিবেন। অর্থাৎ পাখী যেমন ভোর বেলায় বাসা হইতে ক্ষুধার্থ অবস্থায় বাহির হইয়া যায় আর বিকাল বেলায় পেটভর্তী অবস্থায় ঘরে ফিরে, তোমাদের অবস্থাও তেমন হইবে। (তিরমিজি, এবনে মাজা)

عَنْ اَبِى ذَرٍّ(رض)اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّى لاَعْلَمُ اٰيَةً لَوْاَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ -

مشكواة -

হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন, আমি এমন একটি আয়াত জানি মানুষ যদি উহার উপর আমল করিত তবে উহাই তাহাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। ঐ আয়াতের অর্থ হইল এই – " যাহারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে তিনি তাহাদের জন্য রাস্তা খুলিয়া দেন এবং এরূপ স্থান হইতে তাহাদের রিজিক পৌছাইয়া দেন যেখান থেকে রিজিক পৌছিবার কল্পনাও ছিল না। (মেশকাত)

عَنْ اَنَسٍ(رض)قَالَ كَانَ اَخَوَانِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ اَحَدُ هُمَا يَاْتِى النَّبِىَّ(ص)وَالْاٰخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ اَخَاهُ النَّبِىَّ(ص)فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهٖ -

হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, হুজুরের জমানায় দুইজন সহোদর ভাই ছিল, তন্মধ্যে একজন প্রিয় নবীর দরবারে আসা যাওয়া করিত। আর দ্বিতীয় জন কোন কিছু কাজ কর্ম করিত। দ্বিতীয় ভাই হুজুরে পাকের দরবারে প্রথম ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে, সে কোন কাজ কর্ম করে না। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, তুমি তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছ অথচ তোমার জানা নাই যে, তাহার উছিলায়ই তোমার নিকট রিজিক আসিয়া থাকে।

হজরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা জাকারিয়া সাহেব ফরমাইতেছেন, গঙ্গুহ শরীফে আমার অব্বাজানের কুতুবখানায় মুন্সি মোহাম্মদ হোছায়েন ফয়জাবাদী কাজ করিতেন। অর্ডার লওয়া, বান্ডিল বাঁধা, পোস্ট অফিসে লইয়া যাওয়া সব কাজই তিনি করিতেন। আমার চাচাজান হজরত মাওলানা ইলিয়াছ (রঃ) তেলাওয়াত এবং নফল নামাজে প্রায়ই মশগুল থাকিতেন। একবার মুন্সিজী চাচাজানের সাথে কিছু কড়া ব্যবহার করিয়া বলিল, সারাদিন শুধু ঘুরিয়া ফিরিয়া কাটাইতেছেন, মাঝে মধ্যে কিছু কিছু খবরাখবর ত রাখিবেন? আমার আব্বাজান এই কথা শুনিয়া মুন্সিজীকে খুব রাগ করিলেন ও বলিলেন, মুন্সিজী আমি ত মনে করিতেছি আল্লাহ পাক আমার জন্য খাওয়া পরার যে প্রাচুর্য দান করিয়াছেন উহা শুধু এই বাচ্চার উছিলায়ই হইয়া থাকে। তাহাকে কখনও কিছু বলিবেন না। লম্বা কেচ্ছা, হাদীছের মোনাছেব ছিল। মনে আসিল তাই সংক্ষেপে লিখিয়া দিলাম।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّوَجَلَّ لَوْاَنَّ عَبِيْدِىْ اَطَاعُوْنِىْ لَاَسْقَيْتُهُمْ بِاللَّيْلِ وَاَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَمْ اُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ - مشكوٰة

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন, তোমাদের পরওয়ারদেগার বলিতেছেন – আমার বান্দারা যদি আমার হুকুম মানিয়া চলিত তবে আমি তাদের উপর রাত্রি বেলায় বৃষ্টি বর্ষণ করিতাম ও দিনের বেলায় তাহাদের উপর সূর্যের আলো দান করিতাম আর মেঘের গর্জন তাদের শুনাইতাম না।

হজরত আলী খাওয়াছ (রঃ) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَىِّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ

"তোমরা ঐ চিরজীবিত খোদার উপর তাওয়াক্কুল কর যাঁহার কখনও মৃত্যু নাই।"

এই আয়াত পাঠ করিয়া বলেন, বান্দার জন্য এই আয়াতের পর আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও উপর ভরসা করা উচিত নয়।

কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, রুজীর স্বয়ং আল্লাহ্ পাক জিম্মাদারী নিয়াছেন, উহার তালাশে তোমরা যেন আল্লাহ্র ফরজ হইতে গাফেল না হও। কেননা দুনিয়ার অতটুকু অংশ তুমি পাইবে যতটুকু তোমার ভাগ্যে লেখা রহিয়াছে। ফরজ হইতে গাফেল থাকিয়া জাবিকা অর্জনের পিছনে লাগিয়া তোমার মাল বিন্দু মাত্রও বাড়িবে না।

হজরত ইব্রাহীম বিন্ আদহাম (রহঃ) বলেন, আমি কোন পাদরীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি কোথা হইতে খাইয়া থাক। পাদরী বলিল, আমার ত জানা নাই, তবে আমার পরওয়ারদেগারকে জিজ্ঞাসা কর তিনি আমাকে কোথা হইতে খাওয়াইতেছেন।

হজরত শায়খুল হাদীছ (রহঃ) বলেন, আমার লিখিত ফাজায়েলে হজ্ব নামক গ্রন্থে কয়েকটা কেচ্ছা লেখা হইয়াছে।

(১) জনৈক বুজুর্গ বলেন, আমি মক্কা শরীফে ছিলাম। আমাদের নিকটেই একজন নওজওয়ান থাকিত। তাহার নিকট কয়েকটা পুরানো কাপড় ছিল, সে আমাদের নিকট না কখনও আসিত, না কখনও বসিত।

আমার অন্তরে তাহার জন্য খুব ভালবাসা জন্মিয়া গিয়াছিল। কোন এক সময় আমার নিকট সম্পূর্ণ হালাল তরীকায় দুইটি দেরহাম আসিয়াছিল, আমি সেই দুইটি দেরহাম লইয়া যুবকের নিকট গিয়া বলিলাম, ইহা আমার নিকট সম্পূর্ণ হালাল তরীকায় পৌছিয়াছে, তুমি ইহা নিজের কাজে খরচ কর। যুবক আমার প্রতি খুব রুক্ষ নজরে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ ও তাঁহার সান্নিধ্যে বসা আমি নগদ সত্তর হাজার আশরাফী, যাহা আমার নিকট ছিল, তদুপরি স্থাবর সম্পত্তি এবং ভাড়ার বাড়ী-ঘর সব কিছুর বিনিময়ে খরিদ করিয়াছি। অর্থাৎ সব কিছু হইতে মুখ ফিরাইয়া আমি একমাত্র তাঁহারই ছোহবতে বসিয়াছি, তুমি আমাকে এই দুইটা দেরহামের বদলে ধোঁকায় ফেলিতে চাও। এই কথা বলিয়া সে নিজের মোছাল্লা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যুবক যেই ভাবে

বেপরওয়া হইয়া আমাকে অসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া গিয়াছিল উহা বাস্তবিকই একটি করুণ দৃশ্য ছিল। ইহাতে তাহাকে কত সম্মানিত এবং আমাকে কত পর্যুদস্ত মনে হইল। মনে হইল আমার চেয়ে বে-ইজ্জত জীবনে আমি ঐরূপ আর কাহাকেও দেখি নাই।

(২) হজরত শায়খ ইব্রাহীম খাওয়াছের অভ্যাস ছিল–যখন কোন ছফরে যাইবার এরাদা করিতেন কাহারও নিকট বলিতেন না, শুধুমাত্র একটা লোটা হাতে নিয়া রওয়ানা হইতেন। হামেদ আছওয়াদ বলেন, একদিন আমি মসজিদের মধ্যে তাঁহার খেদমতে হাজের ছিলাম। অভ্যাস মোতাবেক তিনি লোটা হাতে নিয়া রওয়ানা হইলেন, আমিও পিছনে পিছনে চলিলাম, আমরা যখন কাদেছিয়া পৌছিলাম তিনি আমাকে বলি-লেন, হামেদ কোথায় যাইতেছ? আমি বলিলাম আমি হুজুরের সঙ্গেই চলিয়াছি। তিনি বলিলেন আমিত মক্কা শরীফ রওয়ানা হইয়াছি। আমি বলিলাম আমিও তথায় যাইব। তিন দিন পথ অতিক্রম করার পর আমাদের সাথে আরেক জন যুবক আসিয়া শামিল হইল। একদিন একরাত চলার পর আমি দেখিলাম যুবকটি এক ওয়াক্ত নামাজও পড়িল না। আমি শায়েখ খাওয়াছকে বলিলাম, আমাদের সাথী লোকটি নামাজ পড়ে না। শায়েখ তাহাকে নামাজ না পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, হজরত, যেহেতু আমি একজন খৃষ্টান, কাজেই আমার উপর নামাজ পড়া জরুরী নয়। তবে আমি খৃষ্টান হওয়া সত্ত্বেও তাওয়াক্কুলের উপর চলিতেছি। আমার নফছ দাবী করিতেছে যে, সে তাওয়াক্কুলে পাকা হইয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে পরীক্ষা করার জন্য এই জনমানব শুন্য মরুভূমিতে আনিয়া ফেলিলাম। শায়েখ তার কথা শুনিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং আমাকে বলিলেন, তুমি তাহাকে কিছুই বলিবা না, সে আমাদের সহিত চলিতে থাকুক। আমরা যখন বত্নে মরবে পৌছিলাম শায়েখ সেখানে কাপড় চোপড় ধোয়ার জন্য অবতরণ করিলেন এবং যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, বেটা তোমার নাম কি? সে বলিল, আবদুর মছিহ। শায়খ বলি-লেন, দেখ আবদুল মছিহ, আমরা মক্কা শরীফের উপকণ্ঠে আসিয়া

পৌছিয়াছি। আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, নিশ্চয় মোশরেকগণ নাপাক, তাহারা যেন মসজিদে হারামের নিকটবর্তী না হয়। কাজেই তুমি সেখানে ঢুকিতে পারিবে না। সেখানে ঢুকিলে আমি তোমাকে বাধা দিব।

হামেদ বলে, আমরা যুবককে সেখানে রাখিয়া মক্কা শরীফ প্রবেশ করিলাম। তারপর আমরা যখন আরাফাতের ময়দানে পৌছিলাম দেখিলাম সে ছেলে এহরাম বাঁধিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে আমাদের কাছে পৌছিয়া গেল ও শায়খকে জড়াইয়া ধরিল। শায়খ বলিলেন, আবদুন মছিহ, কি হইয়াছে তোমার ঘটনা শুনাও। সে বলিতে লাগিল হজরত, আপনারা যখন আমাকে সেখানে ফেলিয়া আসিলেন, আমি মুসলমানের অন্য একটি জামাতকে দেখিতেই তাহাদের সহিত নিজেকে মুছলমান প্রকাশ করিয়া এহরাম বাঁধিয়া মক্কা শরীফ প্রবেশ করিলাম। তারপর বায়তুল্লার উপর আমার যখন দৃষ্টি পড়িল তখন অন্যান্য ধর্মের খেয়াল আমরা অন্তর হইতে মুছিয়া গেল। তৎক্ষনাৎ আমি গোছল করিয়া ইছলাম গ্রহণ করিয়া এহরাম বাঁধিলাম এবং অদ্য ভোর হইতে আপনাকে তালাশ করিয়া ফিরিতেছি। পরে এই ছেলে একজন বিখ্যাত সাধক ছুফী হিসাবে এন্তেকাল করেন।

হজরত শায়খুল হাদীছ হজরত থানবী (রঃ) এর মালফুজাতের উদ্ধৃতি দিয়া বর্ণনা করেন যে, কাফেরের দোয়াও কবুল হইতে পারে যেমন তাহার তাওয়াক্কুলও কার্য্যকরী হইতে পারে। বরং কোন কোন কাফেরের, দোয়া এত বেশী কবুল হইয়া থাকে যে, কোন মুছলমানেরও তদ্রুপ হয় না। যেমন ইবলীছ বলিয়াছিল, "হে খোদা! তুমি আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত সুযোগ দিয়া দাও"। আল্লাহ পাক তাহার এই প্রার্থনা কবুল করিয়াছিলেন।

প্রকৃত পক্ষে কথা হইল এই যে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, "আমার সহিত বান্দা যেইরূপ ধারণা করিয়া থাকে আমি তাহার সহিত সেইরূপ মোয়ামেলা করিয়া থাকি"। এই হাদীছে কুদছীর মর্মানুসারে মুর্ত্তি পূজকদের হাজতও পুরা করিয়া দেন, কেননা তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত সেই ধারনাই করিয়া থাকে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ يَدْعُوْا اللّٰهَ وَهُوَ يُحِبُّهٗ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرَئِيْلُ اقْضِ لِعَبْدِىْ هٰذَا حَاجَتَهٗ وَاَخِّرْهَا فَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَ صَوْتَهٗ وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُوْا اللّٰهَ وَهُوَ يُبْغِضُهٗ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرَئِيْلُ اقْضِ لِعَبْدِىْ هٰذَا حَاجَتَهٗ وَعَجِّلْهَا فَاِنِّىْ اَكْرَهُ اَسْمَعُ صَوْتَهٗ - رواه الطبرانى -

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ হুজুর (সঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বান্দা যখন আল্লাহ্র নিকট কোন জিনিসের প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, হে জিব্রাইল! তুমি আমার অমুক বান্দার হাজত পুরা করিয়া দাও। তবে দেওয়ার ব্যাপারে একটু দেরী করিয়া দিবে। কেননা আমি তাহার আওয়াজ পছন্দ করিয়া থাকি। আর অন্য এক বান্দা যখন আল্লাহ্র নিকট অভিশপ্ত হয় এবং সে কিছু প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ্ তায়ালা জিব্রাঈলকে বলেন, এই বান্দার হাজত পুরা করিয়া দাও এবং খুব তাড়াতাড়ি তাহার কাজ শেষ করিয়া দাও। কেননা, তাহার আওয়াজ আমার নিকট বড় না পছন্দ লাগে। এই প্রসঙ্গে হজরত হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ) দুইটি বয়াত পড়েন যাহার অর্থ হইন এইঃ-

اگررو نا مرا خرش آتاهے -

يه دردورنج تجهكو بها تا هے -

تودردو غم سے نت روتار هو نگا -

ترى الفت مي جى كهو تار هونگا -

" হে খোদা! আমার কান্নাকাটি যদি তোমার নিকট ভাল লাগে, আর আমার এই দুঃখ কষ্ট যদি তোমার নিকট প্রিয় বলিয়া মনে হয়, তবে চিন্তা ও ফিকিরে সব সময়ই আমি কান্নাকাটি করিতে থাকিব, ও তোমার ভালবাসায় তিলে তিলে এ জীবন উৎসর্গ করিতে থাকিব।"

(৩) শায়খ বানান (রঃ) বলেন—আমি মিসর হইতে হজ্ব উপলক্ষে মক্কা শরীফ রওয়ানা হইয়াছিলাম, আমার ছফরের পাথেয় আমার সাথে ছিল। পথিমধ্যে জনৈকা মহিলার সহিত আমার সাক্ষাত হইল। সে বলিল বানান! তোমার কি এই সন্দেহ হইতেছে যে, তিনি তোমাকে খাবার দিবেন না? আমি তাহার কথা শুনিয়া সমস্ত খাদ্যসামগ্রী নিক্ষেপ করিয়া দিলাম। তিন দিন পর্যন্ত আমার কোন খাবার মিলিল না। রাস্তায় চলিতে চলিতে আমি একটা পায়ের অলংকার পাইয়া গেলাম। এই ভাবিয়া উঠাইয়া নিলাম যে, ইহার মালিক পাওয়া গেলে তাহাকে দিয়া দিব। সে হয়তঃ উহার বিনিময়ে আমাকে কিছু দিয়া দিবেন। তারপর সেই মেয়েলোকটি আবার সামনে আসিয়া হাজির। বলিল তুমি দোকানদার হইয়া গিয়াছ নাকি যে সেই অলঙ্কারের পরিবর্তে কিছু চাহিতেছ। অতঃপর সেই মহিলা আমার দিকে কিছু নিক্ষেপ করিয়া বলিল, যাও এইগুলি খরচ করিতে থাক। আমি উহা হইতে খরচ করিতে থাকিলাম। এমন কি ফিরিবার পথে মিসর পর্যন্ত আমার কাজে আসিল। (ফাজায়েলে হজ্ব)

(৪) জনৈক বুজুর্গ একাকী হজ্বের ছফরে রওয়ানা হইয়াছিলেন। বন্ধু-বান্ধব কেহই তাঁহার সঙ্গে ছিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, কাহারও নিকট কোন কিছু চাহিবেন না। পথ চলিতে চলিতে দীর্ঘদিন যাবত খাওয়া দাওয়া না করাতে খুবই দুর্বল হইয়া পড়েন। এবার মনে মনে ভাবিলেন, বর্তমানে যখন আমি মৃত্যু সন্ধিক্ষণে পৌছিয়াছি। তখন আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক নিজেকে ধ্বংসের মুখে না ফেলিয়া কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করা জায়েজ। পরক্ষণেই মনে মনে ভাবিলেন আল্লাহর সঙ্গে যখন ওয়াদা করিয়াছি তখন উহা ভঙ্গ করা কিছুতেই সঙ্গত হইবে না যদিও আমাকে মৃত্যুবরণ করিতে হয়। যেহেতু দুর্বলতার কারণে সামনে

চলার শক্তি ছিল না তাই তিনি নিরুপায় হইয়া কাফেলার পিছনে রহিয়া গেলেন এবং কেবলামুখী হইয়া মৃত্যুর এন্তেজারে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে তাঁহার নিকট জনৈক ছওয়ার আসিয়া একটি বরতন হইতে তাঁহাকে কিছু পানি পান করাইল এবং তাঁহার যত প্রয়োজন সব পুরা করিয়া দিল। অতঃপর তাঁহাকে বলিল, তুমি কি কাফেলার সহিত মিলিতে চাও? বুজুর্গ বলিলেন, কোথায় আমি কোথায় কাফেলা? জানিনা তাঁহারা কতদূর চলিয়া গিয়াছে। লোকটি বলিল, তুমি দাঁড়াও এবং আমার সঙ্গে চল। কয়েক কদম গিয়াই বলিল, তুমি এখানে অপেক্ষা কর, কাফেলা তোমার সহিত আসিয়া একত্রিত হইবে। বুজুর্গ সেখানে রহিয়া গেলেন ও কাফেলা পিছন হইতে আসিয়া মিলিত হইলেন। (ফাজায়েলে হজ্ব)

(৫) চিশ্‌তিয়া তরীকার বিখ্যাত বুজুর্গ হজরত আবদুল ওয়াহেদ বিন জায়েদ (রহঃ) বলিতেছেন– একদিন আমরা সামুদ্রিক ছফরে নৌকায় করিয়া যাইতেছিলাম। হঠাৎ বাতাসের চক্করে আমরা একটি চরে গিয়া পৌঁছি। আমরা সেখানে একজন লোককে দেখিতে পাইলাম যে, মূর্তি পূজা করিতেছে। আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কিসের পূজা করিতেছ? সে মূর্তির দিকে ইশারা করিল। আমরা বলিলাম কি আশ্চর্য তোমার মাবুদকে তুমি নিজ হাতে বানাইয়াছ? সে বলিল, তোমরা কাহার উপাসনা কর? আমরা বলিলাম, ঐ জাতে পাকের যাঁহার সিংহাসন আকাশের উপর এবং তাঁহার রাজত্ব জমীনের উপর। সমস্ত সৃষ্ট জগতের উপর তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভুত্ব। লোকটি বলিতে লাগিল, তোমরা সেই জাতে পাকের সন্ধান কি করিয়া পাইলে? আমরা বলিলাম তিনি আমাদের নিকট একজন রাছুল পাঠাইয়াছেন। তিনি বহুত বড় শরীফ, তিনিই আমাদিগকে এইসব কথা বাত্‌লাইয়াছেন। সে বলিল, সেই রাছুল এখন কোথায়? আমরা বলিলাম, তিনি যখন আল্লাহ্‌র বাণী পৌছাইয়া দেন ও উহার হক পুরা করিয়া দেন তখন মালিক তাঁহাকে তাঁহার পয়গাম পৌছাইয়া দিবার যথোপযুক্ত পুরস্কার দিবার জন্য কাছে নিয়া যান। সে

বলিল, তিনি কি তোমাদের নিকট কোন নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন? আমরা বলিলাম সেই মালিকের পবিত্র কালাম আমাদের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন। লোকটি বলিল, আমাকে সেই পবিত্র কালাম দেখাও। আমরা তাহার নিকট পবিত্র কালাম পেশ করিলাম। সে বলিল আমিত পড়ালেখা জানিনা, তোমরা আমাকে পড়িয়া শুনাও। আমরা তাহাকে একটা ছুরা শুনাইবা মাত্রই সে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। ছুরা শেষ হওয়ার পর সে বলিল, এই পবিত্র কালাম ওয়ালার হক কেহ যেন তাহার নাফরমানী না করে। তারপর সে মুছলমান হইয়া গেল। আমরা তাহাকে ইছলামের হুকুম আহকাম ও নামাজের কয়েকটা ছুরা শিখাইয়া দিলাম। রাত্রি বেলায় আমরা এশার নামাজ পড়িয়া যখন শুইতে লাগিলাম তখন লোকটি বলিল তোমাদের মাবুদ কি শয়ন করিয়া থাকেন? আমরা বলিলাম সেই পাকজাত চিরঞ্জীব, চিরজাগ্রত। তাঁহার তন্দ্রাও নাই, নিদ্রাও নাই। সে বলিতে লাগিল, তোমরা কত নালায়েক বান্দা, তোমাদের প্রভু নিদ্রা যান না আর তোমারা ঘুমাইয়া পড়। তার কথায় আমরা আশ্চর্য হইয়া গেলাম। আমরা যখন সেই দ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম লোকটি বলিল, আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নিয়া চল তাহা হইলে আমি তোমাদের নিকট হইতে দ্বীন শিখিতে পারিব। আমরা তাহাকে সঙ্গে করিয়া হামাদান শহরে গেলাম। আমি সেখানে গিয়া সাথীদেরকে বলিলাম, এই লোকটি নওমুছ-লিম তাহার জীবিকার কিছু ফিকির করা উচিত। কাজেই আমরা চাঁদা করিয়া কছু দেরহাম তাহাকে দিয়া দিলাম। সে বলিল এই গুলি কি? আমরা বলিলাম কয়েকটি দেরহাম, ইহা তুমি নিজের কাজে খরচ করিও। সে বলিতে লাগিল, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু তোমরা আমাকে এমন রাস্তা দেখাইয়া যাহার উপর তোমরা নিজেরাই চলিতেছ না। আমি একটি দ্বীপে আবদ্ধ ছিলাম, সেখানে মূর্তি পূজা করিতাম, আল্লাহ তায়ালাকে চিনিতাম না, তবুও তিনি আমাকে সেখানে ধ্বংস করেন নাই বরং প্রতিপালন করিয়াছেন, আর এখন আমি তাঁহাকে চিনিতেছি, তাঁহার এবাদত করিতেছি, এমতাবস্থায় তিনি আমাকে কেমন করিয়া ধ্বংস করিবেন? তিন দিন পর আমরা জানিতে পারিলাম লোকটি মৃত্যুশয্যায়। আমরা তাহার শয্যাপার্শে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কি কোন জিনিসের প্রয়োজন

আছে? সে বলিল, সেই জাতে পাক যিনি তোমাদিগকে আমার হেদায়াতের জন্য সেই দ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন তিনি আমার যাবতীয় হাজত পুরা করিয়া দিয়াছেন।

হজরত শায়খ আবদুল ওয়াহেদ বলেন, হঠাৎ সেখানেই আমার নিদ্রা আসিয়া গেল ও আমি শুইয়া পড়িলাম এবং আমি স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম যে, একটি অপূর্ব সুন্দর চিরবসন্ত বিরাজিত বাগান, সেই বাগানে এক সুরম্য অট্টালিকা, আর তথায় একটি তখ্তের উপর উপবিষ্ট একটি অনিন্দ সুন্দরী নারী যাহার মত সুন্দরী নারী কেহ কোন কালেও দর্শন করে নাই। সেই সুন্দরী শুধু এই বলিয়া হাহাকার করিতেছে যে, খোদাকে ওয়াস্তে তাহাকে আমার নিকট খুব তাড়াতাড়ি পাঠাইয়া দাও, মিলন ও দর্শন লাভের আশায় আমি অন্তহীন পেরেশান হইয়া পড়িয়াছি। আমার ঘুম যখন ভাঙ্গিল, দেখিতে পাইলাম সেই যুবকের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে। আমরা তাহার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করিলাম। রাত্রি বেলায় আমি সেই বাগান কোব্বা এবং তখ্তের উপর উপবিষ্ট সেই মেয়েটিকে তাহার পার্শ্বেই দেখিতে পাইলাম। লোকটি কোরান শরীফের এই আয়াত পড়িতেছিল।

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ

অর্থাৎ ফেরেশতারা তাহাদের উপর প্রত্যেক দরজা দিয়া ছালাম করিতে করিতে প্রবেশ করিবে।

আল্লাহ পাকের রহমতের ও বখশিশের কী অপূর্ব নিদর্শন। সারা জীবন মুর্তি পূজা করা সত্ত্বেও কি এক হেকমতের সহিত নৌকা ওয়ালাদের সাহায্যে তাহাকে হেদায়েত করিয়া জান্নাতবাসী করিয়া দেন।

" হে খোদা। তুমি যাহাকে দান করিতে চাও তাহাকে রুখিবার মত কেউ নাই। আর তুমি যাহাকে না দিতে চাও তাহাকে দিবার মত কেউ নাই। (ফাঃ ছাদাকাত)

(৬) বিখ্যাত ছুফী ও বুজুর্গ হজরত জুন্নুন মিছরী (রঃ) বলেন, আমি এক সময় জনমানব শূন্য ময়দান দিয়া যাইতেছিলাম। হঠাৎ জনৈক যুবকের সহিত আমার সাক্ষাত হইল যাহার মুখ মুন্ডলে সবে মাত্র দাড়ি গজাইতেছিল। আমাকে দেখিয়াই তাহার শরীরে কম্পন আসিয়া গেল। চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল এবং আমার কাছ থেকে পালাইতে লাগিল। আমি বলিলাম বেটা আমি ত কোন জিন নহি, বরং তোমার মতই একজন মানুষ। তুমি কেন ভাগিতেছ। সে বলিতে লাগিল, আমি তোমাদের মত মানুষ হইতেই ত পালাইতেছি। আমি তাহাকে কছম দিয়া বলিলাম, একটু দাঁড়াওনা ভাই। সে দাঁড়াইয়া গেল। আমি বলিলাম, এই নির্জন মরুপ্রান্তরে তুমি কি একাই থাক? এখানে কি তোমার কোন বন্ধু নাই? তোমার কি কোন ভয় হয় না? সে বলিতে লাগিল, হ্যাঁ আমার একজন বন্ধু আছে। আমি ভাবিলাম সে হয়ত কোথাও গিয়াছে, তাই বলিলাম সে কোথায়? উত্তর করিল, তিনি সর্বদা আমার সাথেই থাকেন, ডানে বামে অগ্রে পশ্চাতে চতুর্দিকেই তিনি আছেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার খাওয়া পরার কোন ব্যবস্থা আছে কি? সে বলিল নিশ্চয় আছে। আমি বলিলাম উহা কোথায়? সে উত্তর করিল যিনি মায়ের উদরে আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন, বড় অবস্থায়ও তাঁহারই জিম্মায় আমার রিজিক রহিয়াছে। আমি বলিলাম অবশেষে তোমার খাওয়া পরার ব্যবস্থাত নিশ্চয় কিছু থাকা উচিত যদ্দারা তাহাজ্জুদে দাঁড়াইবার শক্তি পাওয়া যাইবে, দিনের বেলায় রোজা রাখার শক্তি মিলিবে ও শারীরিক শক্তির দ্বারা ভালভাবে আল্লাহ্‌র এবাদত করিতে পারিবে। আমি খানা পিনার উপর খুব জোর দিলাম। ইহাতে সে কয়েকটা বয়াত পড়িয়া আমার নিকট হইতে খুব দ্রুত চলিয়া গেল।

"আল্লাহ্‌র অলীর জন্য কোন ঘরের প্রয়োজন হয় না, তাহার কোন সম্পত্তি হউক ইহা সে কখনও পছন্দ করে না। সে যখন জঙ্গল হইতে পাহাড়ের দিকে চলিতে থাকে তখন জঙ্গল তাহার বিচ্ছেদে ক্রন্দন করিতে থাকে- যেখানে সে প্রথমে ছিল। সে রাত্রের তাহাজ্জুদ এবং দিনের বেলায়

রোজা রাখার উপর নিত্যন্ত ধৈর্য্যশীল হইয়া থাকে, সে নিজের নফছকে বুঝাইয়া দেয়, যে যতটুকু সম্ভব, মেহনত করিয়া লও কেননা রহমানুর রাহীমের দরবারে উহা কোন লজ্জার বিষয় নয়, বরং গৌরবের বস্তু। সে যখন আপন প্রভুর সহিত কথোপকথন করে তখন তাহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। আর সে বলিতে থাকে, হে খোদা। আমার অন্তর উড়িয়া যাইতেছে। তুমিই উহার খবর লও, এবং ইহাও বলে যে হে পরওয়ারদেগার। আমি বেহেশতের মধ্যে ইয়াকুতের কোন ঘর চাহি না, যেখানে হুর পরীগণ অবস্থান করিতেছেন। আমার না জান্নাতে আদনের প্রয়োজন রহিয়াছে, না জান্নাতের ফুল সমূহের আকাংখা রহিয়াছে। আমার যাবতীয় আরজু ও আকাংখা হইল একমাত্র তোমার দীদার লাভ, উহা দান করিয়া আমায় ধন্য কর। উহাই হইল আমার জন্য সব চেয়ে গৌরবের বস্তু। (ফাঃ ছদাকাত)

(৭) হজরত ইব্রাহিম খাওয়াছ (রঃ) বলেন, আমি একদিন কোন এক নির্জন ময়দান দিয়া যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে জনৈক নাছারা আমার সাথী হইয়া গেল, তাহার কোমরে পাদরীদের নিদর্শন জুন্নার বাঁধা ছিল। সে আমার সাথে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করিল। আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিলাম। আমরা ক্রমাগত সাত দিন পর্য্যন্ত খাওয়া দাওয়া ব্যতীত চলিতে লাগিলাম। সপ্তম দিন খৃষ্টান লোকটি বলিল, হে মোহাম্মদী। আজ কয়দিন আমাদের কোন খানা পিনা নাই, কাজেই তুমি নিজের কিছু বুজুর্গী দেখাও। আমি আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করিলাম, হে খোদা। তুমি এই কাফেরের সামনে আমার সম্মুখে একটা ঝুড়িতে ভর্ত্তী রুটি, ভূনা গোশ্‌ত এবং তাজা তরীতরকারী ও এক ঘটি পানি উপস্থিত কর আমরা উভয়ে তৃপ্তি সহকারে খাওয়া দাওয়া করিয়া আবার রওয়ানা হইলাম। সাত দিন চলার পর লোকটিকে কিছু বলার আগেই আমিই প্রথমে বলিয়া ফেলিলাম ভাই এবার তুমি কিছু দেখাও। কারণ এবার তোমার পালা। সে নিজের লাঠিতে ভর করিয়া দোয়া করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে আগের চেয়ে দ্বিগুণ খানা আমাদের সামনে আসিয়া হাজির। আমি বড় লজ্জিত হইয়া গেলাম, আমার চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। পেরেশান অবস্থায় মনের দুঃখে আমি খাবার খাইতে অস্বীকার করিলাম। নাছরানী বলিল, ভাইয়া খাও। আমি তোমাকে

দুইটা সুসংবাদ শুনাইতেছি শুন। প্রথমতঃ আমি কালেমা শাহাদত পড়িয়া মুছলমান হইয়া গেলাম, এই বলিয়া কালেমা পড়িয়া সে জুন্নার ছিঁড়িয়া ফেলিল। দ্বিতীয় সুসংবাদ এই যে, আমি খোদার দরবারে খানার জন্য এই বলিয়া দোয়া করিয়াছিলাম, হে খোদা! এই লোকটার যদি তোমার দরবারে কোন মর্যাদা থাকে তবে তাহার উছিলায় আমাকে খানা দাও। উহাতেই এই খানা আসিল ও আমি মুছলমান হইয়া গেলাম। অতঃপর আমরা উভয়ে খানা খাইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলাম ও মক্কা শরীফ পৌঁছিয়া হজ্ব আদায় করিলাম। সেই নও মুছলিম মক্কা শরীফেই থাকিয়া গেল এবং সেখানেই এন্তেকাল করিল। (ফাঃ ছাদাকাত)

(কাফেরদের এইভাবে ইছলাম গ্রহণের অনেক কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লিখিত রহিয়াছে। এই ঘটনার দ্বারা আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ পাক অনেক সময় একের উছিলায় অন্যকে রুজী দান করিয়া থাকেন। যাহারা রিজিক পায় তাহারা নিজের মুর্খতা বশতঃ উহাকে আপন কৃতকর্মের ফলাফল বলিয়া মনে করিয়া থাকে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে " তোমাদের দুর্বলদের উছিলায় তোমাদিগকে রুজী দেওয়া হয়।"

উক্ত ঘটনার দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, মুছলমানের উছিলায় কাফেরদের জন্যও অনেক সময় গায়েবী মালের দরওয়াজা খুলিয়া যায়, যাহাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাফেরদের প্রতি সাহায্য বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা অন্যদের উছিলায় হইয়া থাকে।

তাওয়াক্কুল সম্পর্কে উল্লেখিত কোরান ও হাদীছ ছাড়াও আল্লাহর মোখ্লেছ প্রেমিক বান্দাদের কত হাজার ঘটনা বর্ণিত আছে তাহার কোন সীমারেখা নাই, তবে ঐ সব অত্যাশ্চার্য ঘটনাবলীতে লক্ষ্যণীয় বস্তু হইল তিনটিঃ-

প্রথমতঃ ঐ সমস্ত হালত এবং ঘটনাবলী যাহা বর্ণিত হইয়াছে এশক্ মোহাব্বত ও তাওয়াক্কুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐসব বস্তু সাধারণ নিয়মকানুনের অনেক উর্দ্ধে।

مکتب عشق کے اندا زنرا لے دیکھے -
اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا

অর্থাৎঃ প্রেমের নিয়ম কানুন কোন সাধারণ আইন কানুনের আওতাভুক্ত নয়, ইহা পড়ালেখার দরুন হাছেল হয় না বরং প্রেম সৃষ্টির দ্বারাই হইয়া থাকে।

محبت تجھکواد اب محبت خود سکھلا دیگی -

"ভালবাসা নিজেই তোমাকে ভালবাসার আদব কায়দাসমূহ শিক্ষা দিবে।"

স্বীয় কর্তব্য কোশেশ ও চেষ্টা করিয়া এই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়, তারপর সমস্ত পরিশ্রমই সহজ হইয়া যায়, আর যাবতীয় কষ্টই লজ্জতে পরিণত হইয়া যায়। যারা প্রেমিক নয় তাদের জন্য যাহা মছিবত ধ্বংসের সামগ্রী, প্রেম সমুদ্রের ডুবরীদের জন্য উহাই হইল শান্তি ও লজ্জতের আছবাব। এই সমুদ্রে যারা ডুব দেয় পরিণামে কি হইবে ঐ সব চিন্তাধারা হইতে তারা অনেক উর্দ্ধে। কবি বলেন -

"প্রেম সমুদ্রের কূল কিনারা অন্বেষণ করা নিরর্থক, কারণ এখানে ডুবিয়া যাওয়ার অর্থই হইল পার হইয়া যাওয়া। আহ্‌লে মা'রেফত বলেন, যাহারা এশ্‌ক ও মহব্বত হইতে বঞ্চিত তাহারা এইসব প্রেমিকদের ঘটনাবলী দ্বারা কোন প্রমাণও পেশ করিতে পারে না। আর উহার উপর আক্রমণাত্মক প্রশ্ন করারও তাহাদের কোন অধিকার নাই। ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন, যাহারা মহব্বতের পেয়ালা একবার পান করে সে-ই নিশাগ্রস্ত হইয়া যায় আর যে নিশাগ্রস্ত হইয়া যায় তার কথার মধ্যে প্রশস্ততা আসিয়া যায়। তার সেই নিশা যখন দূর হইয়া যায় তখন সে দেখিবে যে উহা তাহার ছিল একটা 'হাল' মাত্র। বাস্তব নয়। আর প্রেমিকদের কথা দ্বারা লজ্জত হাছেল করা যায়, উহার উপর ভরসা করা যায় না। (এহ্‌ইয়া)

দ্বিতীয় কথা হইল এই যে, এইসব কেচ্ছা কাহিনীতে তাওয়াক্কুলের যেইসব দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে আমাদের মত নালায়েকদের উহার উপর আমল করা ত দূরের কথা উহার বিষয় চিন্তা করাও দুরূহ ব্যাপার। ঐ সবের ব্যাপারে শুধু এতটুকু মনে রাখা উচিত যে, ঐসব কাহিনীর দ্বারা যাহা প্রকাশ পায় উহাই তাওয়াক্কুলের শেষ পর্যায়। সেই পর্যন্ত পৌছার চেষ্টা এবং কমপক্ষে মনে মনে উহার আকাংখ্যা হইতেই হইবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ মরতবা হাছেল না হয় সেই পর্যন্ত আছবাব পরিত্যাগ করা কিছুতেই উচিত নয়।

জনৈক বুজুর্গ বলেন, আমি হজরত আবদুর রহমান বিন্ ইয়াহ্ইয়ার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, তাওয়াক্কুলের হাকীকত কি? তিনি উত্তর করিলেন - তুমি যদি একটি বিষধর সর্পের মুখে হাত দিয়া দাও এবং সর্প তোমার হাতের কব্জা পর্যন্ত খাইয়া ফেলে। তখনও তোমার আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও ভয় না আসে, ইহাকেই বলে প্রকৃত তাওয়াক্কুল। অতঃপর আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করার নিয়তে হজরত বায়েজীদের খেদমতে হাজির হইলাম এবং তাঁহার দরওয়াজায় খ্‌ট খট্ করিয়া আওয়াজ দিলাম। তিনি ভিতর হইতে উত্তর দিলেন, আবদুর রহমান তোমাকে যে উত্তর দিয়াছেন উহাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল, আমাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য আবার কেন আসিয়াছ? আমি বলিলাম, হজরত।- আপনি দয়া করিয়া দরওয়াজা খুলুন। তিনি বলিলেন, না তা হইবে না, তুমি মোলাকাত করিতে আস নাই। প্রশ্ন করিতে আসিয়াছ। আর উহার উত্তর ত পাইয়াই গিয়াছ। আমি ফিরিয়া গেলাম এবং এক বৎসর পর পুনরায় তাঁহার সাক্ষাত প্রার্থী হইলাম। এবার তিনি ঘরের কেওয়াড় খুলিয়া বলিলেন, হ্যাঁ এবার তুমি মোলাকাতের জন্য আসিয়াছ।

মোল্লাআলী ক্বারী (রঃ) মেশ্‌কাতের শরাহ মেরকাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, আছবাব এখ্‌তিয়ার করা তাওয়াক্কুলের কোন পরিপন্থী নয়। যদি কোন ব্যক্তি নিখুঁত তাওয়াক্কুলের এরাদা করে তবে উহাতেও কোন অসুবিধা নাই তবে শর্ত হইল আছবাব ছাড়িয়া সে যেন কোন প্রকার পেরেশান না

হয় বরং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন দিকে তাহার খেয়ালও আসে না। আর যাহারা আছবাব ত্যাগ করাকে অন্যায় বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন উহার কারণ এই যে, মানুষ উহার হক আদায় করে না বরং অন্য লোকের খাদ্য সামগ্রীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকে ।

হুজুর আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালার উপর যেমন তাওয়াক্কুল করার হক তেমনি তাওয়াক্কুল করিতে পার তবে পাখীদের মত তিনি তোমাদিগকে রিজিক দান করিবেন। পাখীরা ভোর বেলায় ক্ষুধার্থ অবস্থায় নিজ নিজ বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়ে আর বিকাল বেলায় উদর পূর্ণ করিয়া ঘরে ফেরে। প্রিয় নবী (ছঃ) আরও এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি যাবতীয় মাখলুক হইতে মুখ ফিরাইয়া এক মাত্র খোদায়ে পাকের দিকেই রুজু করে তবে খোদা পাক এমন স্থান হইতে তাহার রিজিকের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, যেখান হইতে আসিবার তাহার কোন কল্পনাও ছিল না।

উল্লেখিত বিষয়বস্তু হাদীছ শরীফের দুইটি ঘটনার দ্বারা পরিস্কার বুঝা যাইতে পারে। প্রথমতঃ হজরত আবু বকর ছিদ্দীকের ঘটনা, নবীয়ে করীম (ছঃ) তবুকের যুদ্ধে যখন ছাহাবাদের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছিলেন তখন হজরত আবু বকর ছিদ্দীক ঘরের যাবতীয় সামগ্রী আনিয়া প্রিয় হাবীবের দরবারে পেশ করেন। হুজুর (ছঃ) যখন জিজ্ঞাসা করেন যে, আবুবকর। আপনি ঘরে কি রাখিয়া আসিয়াছেন? তখন তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, ঘরে আল্লাহ ও তাঁহার রাছুলকে রাখিয়া আসিয়াছি।

দ্বিতীয় ঘটনা হইল এই যে, জনৈক ব্যক্তি প্রিয় নবীর খেদমতে আসিয়া ডিমের বরাবর একটা স্বর্ণের টুকরা পেশ করিয়া আরজ করিল, হুজুর! ইহা আমি কোন এক খনি হইতে পাইয়াছি, আমি উহা আল্লাহর রাস্তায় দান করিলাম, ইহা ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নাই। হুজুর (ছঃ) তাহার কথায় কোন কর্ণপাত করিলেন না। লোকটি দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয় বার হুজুরকে একই কথা বলিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। এবার প্রিয়

নবী তার হাত হইতে স্বর্ণের টুকরাটা নইয়া এত জোরে নিক্ষেপ করিলেন যে লোকটির গায়ে লাগিলে নিশ্চয় সে জখম হইয়া যাইত। অতঃপর হুজুর(ছঃ) এরশাদ করেন, কোন কোন লোক নিজের সমস্ত সম্পদ ছদকা করিয়া দেয় এবং পুনরায় লোকের নিকট ভিক্ষার জন্য হাত বাড়াইয়া দেয়। (আবু দাউদ)

উভয়ের মধ্যে কত বড় পার্থক্য। এই জন্য ত প্রিয় নবী (ছঃ) হজরত ছিদ্দীকে আকবরের সর্বস্ব কবুল করিনেন আর দ্বিতীয় ব্যক্তির দানের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

তাওয়াক্কুলের স্তর তিনটি

ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন, তাওয়াক্কুলের তিনটি স্তর রহিয়াছে। প্রথম স্তর হইল এইরূপ যেমন কোন ব্যক্তি যে কোন মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে একজন অভিজ্ঞ, জ্ঞানী এবং দক্ষ লোককে উকিল নিযুক্ত করিল, সে প্রতিটি ব্যাপারে সেই উকিলের সরণাপন্ন হয়। কিন্তু লোকটির উকিলের উপর এই তাওয়াক্কুল বা ভরসা ক্ষণস্থায়ী। সে নিজের তাওয়াক্কুল সম্পর্কে খুবই সচেতন।

দ্বিতীয় স্তর হইল যাহা প্রথম স্তর হইতে একটু উন্নত ধরনের এইরূপ যেমন অবুঝ ছেলের মায়ের প্রতি আকর্ষণ। প্রত্যেক ব্যাপারেই সে মাকে ডাকিতে থাকে। এবং যে কোন দুঃখে কষ্টে বা বিপদে আপদে তার মুখ দিয়ে প্রথমেই মা শব্দ বাহির হইয়া যায়। এই দুই স্তরের দিকেই হজরত হজর (রাঃ) ইশারা করিয়াছিলেন। যখন তাহাকে কেউ জিজ্ঞাসা করিল, তাওয়াক্কুলের নিম্ন স্তর কি? তিনি বলেন নিজের সমস্ত আশা আকাংখ্যাকে ত্যাগ করিয়া দেওয়া। প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, মধ্যম স্তর কি? তিনি বলেন, নিজের এখতিয়ারকে পরিত্যাগ করা। প্রশ্নকারী আবার জিজ্ঞাসা করিল, সব চেয়ে উঁচু স্তর কোন্টা? তিনি বলেন উহাকে সেই ব্যক্তিই চিনিতে পারিয়াছে যে দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছিয়াছে।

ইমাম গাজালী (রহঃ) বলেন, তাওয়াক্কুলের সব চেয়ে উচ্চস্তর হইল এই যে, আল্লাহ পাকের সহিত এমন সম্পর্ক গড়িয়া তোলা যেমন মৃত

ব্যক্তির অবস্থা হয় যে গোছল দেয় তার হাতে। অর্থাৎ মুর্দার নড়া চড়ার কোন শক্তিই থাকেনা। কেহ এই দরজায় পৌছিয়া গেলে আল্লাহ্‌র দরবারে তখন আর চাহিবারও প্রয়োজন হয় না। বিনা চাহিদায়ই আল্লাহ্‌ পাক তাহার যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইয়া দেন। যেমন গোছল দেনেওয়ালা নিজেই মুর্দার গোছলের যাবতীয় প্রয়োজন পুরা করিয়া দেয়। (এহ্‌ইয়াউল উলুম)

উল্লেখিত তাওয়াক্কুলের ঘটনাবলীর উপর একটা প্রশ্ন এই জাগে যে, প্রিয় নবী হুজুরে পাক (ছঃ) এর সাধারণ অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি আছবাবের পিছনে মেহনত করিতেন। হুজুর কেন ইহা করিতেন, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিলেইত হুজুরের জন্য যথেষ্ট ছিল। তার উত্তর হইল এই যে, আমাদের প্রাণ প্রিয় মাহবুব নবীর যাহা শান ছিল তাহাই তিনি করিতেন। যদি হুজুর (ছঃ) এর হাল হক্কীকৃত তাওয়াক্কুল সম্পর্কীয় ঐ সমস্ত ঘটনাবলীর অনুরূপ হইত তবে হুজুরের উম্মত বড় কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া পড়িত। যেহেতু আমাদের প্রাণ প্রিয় মাহবুব নবী (ছঃ) স্বীয় উম্মতের জন্য দারুণ মেহেরবান ছিলেন তাই তিনি এমন সব কর্মকান্ড হইতে বিরত থাকিতেন যদ্দারা উম্মত কষ্টের মধ্যে নিপতিত হইবে। আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, প্রিয় নবী (ছঃ) চাশ্‌তের নামাজ পড়িতেন না অথচ আমি পড়িতাম। নিশ্চয় হুজুর আমল করার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অনেক আমল এই ভয়ে ছাড়িয়া দিতেন যে, হয়ত হুজুর করিতে থাকিলে উহা উম্মতের উপর ফরজ হইয়া যাইবে। (আবু দাউদ)

আম্মাজান হজরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, হুজুর (ছঃ) চাশ্‌তের নামাজ পড়িতেন না এবং আমি পড়িতাম। তার অর্থ এই যে, প্রিয়নবী খুব গুরুত্ব সহকারে সব সময় পড়িতেন না আর আমি খুব গুরুত্ব সহকারে পড়িতাম। নতুবা ভুরি ভুরি রেওয়ায়েত রহিয়াছে যে, হুজুর চাশ্‌তের নামাজ আদায় করিতেন। তবে কথা হইল এই যে, হুজুর যদি খুব এহ্‌তেমামের সহিত পড়িতেন তবে উহা উম্মতের পর ওয়াজেব হইয়া যাওয়ার আশংকা ছিল। তারাবীহ্‌ নামাজের ব্যাপারেও বহু রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে যে, হুজুর (ছঃ) কয়েকদিন যাবত পড়িয়া পরে ছাড়িয়া দিয়া

ছিলেন, ছাহাবাদের এই নামাজের জন্য আগ্রহ এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন যখন প্রিয় হাবীব (ছঃ) ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন না তখন ছাহাবারা ভাবিলেন, হুজুর হয়ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। তারপর তাঁহারা এমন পলিসি অবলম্বন করিলেন যেন না জাগাইলেও প্রাণের নবী জাগিয়া পড়েন। অবশেষে মেহেরবান নবী বলেন, তোমাদের কার্যকলাপ আমি সব কিছুই দেখিতে পাইতেছি, তবে মনে রাখিও আল্লাহ্‌র শোকর আমি এই রাত্রেও গাফেল অবস্থায় শুইয়া পড়ি নাই। হ্যাঁ মসজিদে আমি শুধুমাত্র এই ভয়ে হাজির হই নাই যে, উহা তোমাদের উপর ফরজ হইয়া যায় নাকি, আর ফরজ হইয়া পড়িলে উহার হক্ব আদায় করা তোমাদের উপর মুশকিল হইয়া পড়িবে। (আবু দাউদ)

ছাহেবে 'রওজ' লিখিয়াছেন, যেই সমস্ত আছবাব অবলম্বন করিলে উপকৃত হওয়া যায় এবং দুঃখ কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় উহা ব্যবহার করা সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আওলিয়ায়ে এজামের তরীকা। কিন্তু ইহা দ্বারা ঐসব আওলিয়াদের উপর যাহারা বিপদের ঝুঁকি নিতেন ও বাঁচিবার উপায় অবলম্বন করিতেন না প্রশ্নকরা উচিত হইবে না। কেননা তাঁহাদের মধ্যে ধৈর্য সহকারে ঐগুলি মোকাবেলা করার শক্তি ছিল। আর আমাদের প্রাণ প্রিয় মেহেরবান নবীত স্নেহের উম্মতকে শরীয়তের উপর চলাইতেন এবং এমন সহজ সরল পথ দেখাইতেন যাহার উপর সাধারণ অসাধারণ সব রকম মানুষই চলিতে পারে। যদি কাফেলার সর্দার কাফেলার লোককে এইরূপ কঠিন ও দুর্গম পথে পরিচালনা করেন যেখানে দিয়া অতিক্রম করা শক্তিমান হওয়ার দরুন সর্দারের পক্ষেত সম্ভব কিন্তু কাফেলার অধিকাংশ লোক সে পথে চলিতে অক্ষম তবে সেই সর্দারকে কোন ব্যক্তি কাফেলাওয়ালাদের উপর দয়ালু বলিয়া গণ্য করিবে না।

ঐ সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যে তৃতীয় একটি জিনিসও বিশেষ লক্ষণীয় যাহা প্রতমটারই অনুরূপ। সেটা হইল এই যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন কোন ঘটনা এত বেশী কঠিন মনে হয় যেন নিজকে নিজে ধ্বংসের মুখে

ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে এবং উহাকে নাজায়েজ বলিয়াও মনে হয়। সেই সম্পর্কে এই কথা বুঝিয়া লওয়া উচিৎ যে, এই সমস্ত ঘটনাবলী ঔষধ সমতুল্য। আর ঔষধের মধ্যে অনেক সময় অভিজ্ঞ ডাক্তার কিছুটা বিষের সংমিশ্রণও দেয়। কিন্তু উহার ব্যবহার ডাক্তারের পরামর্শ মত করা নিতান্ত জরুরী। কারণ ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ব্যবহার করিলে অনেক সময় উহা ধ্বংসের কারণ হইয়া যায়। এই ভাবে তাওয়াক্কুল সম্পর্কীয় কাহিনী সমূহে যেই সব বিচক্ষণ ডাক্তারগণ ঐসব ঔষধ সেবন করিয়াছেন তাহাদের উপর সমালোচনার ঝড় উঠানো উক্ত বিষয় সম্পর্কে নিজমূর্খতা ও অনভিজ্ঞতার প্রতিফল। যে কখনও ডাক্তার নয় আর যার কোন ডাক্তারের পরামর্শও জানা নাই তাহাদের জন্য শীয়তের খেলাফ বলিয়া চিহ্নিত বস্তুসমূহ এখ্তিয়ার করা নাজায়েজ। সুতারং তাওয়াক্কুলের রহস্যাবলী সম্পর্কে যাহা অবহিত তাহাদের কার্যকলাপের উপর অনভিজ্ঞ লোকদের সমালোচনা করা গুরুতর অন্যায়। নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া নিশ্চয় অন্যায়, কিন্তু দ্বীনী প্রয়োজনের তাকীদে উহা জায়েজেরও উর্দ্ধে উঠিয়া যায়। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন দুই ব্যক্তির আমলের উপর আল্লাহ পাক অপরিসীম সন্তুষ্ট হন। প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তি যে নরম নরম বিছানায় লেপের ভিতর আপন প্রিয়তমা পত্নির সহিত শুইয়া থাকে, আর হঠাৎ করিয়া তার সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়েও নামাজে দাঁড়াইয়া যায়, আল্লাহ পাক এই ব্যক্তির জন্য ফেরেশ্তাদের নিকট গর্ব করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যে মূজাহেদীনদের সহিত মিলিত হইয়া শত্রু সেনার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে থাকে আর তার সঙ্গীরা পরাজিত হইয়া পলাইতে আরম্ভ করে এমতাবস্থায় সে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হইয়া একাকী শত্রুর মোকাবেলা করিয়া শহীদ হইয়া যায়। তখন আল্লাহ পাক বলিতে থাকেন দেখ আমার বান্দা আমার পুরস্কারের আশায় ও আমার অসন্তুষ্টির ভয়ে ময়দানে ফিরিয়া আসিল ও নিজের রক্ত প্রবাহিত করিয়া দিল।

এখন এই ব্যক্তি যে একা ফিরিয়া আসিল নিশ্চয় সে মৃত্যুর জন্যই আসিল। কারণ যখন সমস্ত সেনাদলই পলাইয়া গেল তখন একটি মাত্র লোক কি করিতে পারে? ইহা সত্ত্বেও পরওয়ারদেগারে আলম ফেরেশ্তাদের নিকট তাহার জন্য গর্ব করিতেছেন।

'কাওকাব' গ্রন্থে লিখিত আছে, তাওয়াক্কুল কয়েক প্রকার হইয়া থাকে। এক প্রকার তাওয়াক্কুল হইল যাহা পরিস্কার শরীয়তের বিপরীত, যেমন কেহ তাওয়াক্কুল করিয়া বিষপান করিয়া ফেলিল, অথবা পাহাড় হইতে লাফাইয়া পড়িল, অথবা একেবারেই খানা পিনা ছাড়িয়া দিল, অথচ ইহার একটি শক্তিও কাহারও মধ্যে নাই। এইরূপ তাওয়াক্কুল করা আল্লাহ্র হুকুম "তোমরা নিজের নফছকে আপন হাতে ধ্বংসের মধ্যে ফেলিও না" এর সম্পূর্ণ খেলাফ। কাজেই এইরূপ তাওয়াক্কুল করা হারাম।

তাওয়াক্কুলের দ্বিতীয় ছুরত হইল এই যে, মানুষ এমন বস্তুকে পরিত্যাগ করা যাহার উপকার সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে, যেমন ঔষধ সেবন করা। ইহা হইল তাওয়াক্কুলের শ্রেষ্ঠ স্তর। আবার তাওয়াক্কুলের তৃতীয় ছুরত হইল এই যে, এমন বস্তুকে ছাড়িয়া তাওয়াক্কুল করা যাহার উপকারিতা সম্পর্কে তেমন কোন আশাই নাই। যেমন ঝাড় ফূঁক না করা। ইহা হইল তাওয়াক্কুলের শেষ স্তর।

কাওকাব গ্রন্থের অন্য স্থানে হাদীছের ভাবার্থ এই ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে–

"জানা গেল যে, তাওয়াক্কুলের শ্রেষ্ঠ দরজা হইল, আছবাব' এখ্তিয়ার করা অথচ উহার উপর ভরসা না করা, আবার পরবর্তী পর্য্যায়ে আছবাবকে একেবারেই এখ্তিয়ার না করা।" শায়খুল মাশায়েখ হজরত শাহ্ অলি-উল্লাহ দেহলবী (রঃ) 'দোর্‌রে ছামীন' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, আমি একবার হুজুরে আকরাম (ছঃ) কে রুহানী জগতে প্রশ্ন করিয়াছিলাম আছবাবের পিছনে লাগিয়া থাকা এবং উহাকে একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়া উভয়ের মধ্যে কোন্‌টা উত্তম? তখন প্রিয়নবীর তরফ হইতে আমার উপর একটা রুহানী ফয়েজ জারী হইল যদ্দারা আছবাব এবং আওলাদ ইত্যাদির দিকটা যেন একেবারেই ম্লান হইয়া গেল। তার খানিকটা পরেই আমার পূর্ববর্তী হাল দূরীভূত হইয়া গেল এবং আমি আমার বিবেককে আছবাবের প্রতি আকৃষ্ট দেখিতে পাইলাম। এবং আমার রুহকে আছবাব হইতে হটাইয়া আল্লাহ তায়ালার উপর সপর্দ করার দিকে মনোযোগী দেখিতে পাইলাম। কোন কবি বলিয়াছেন–

از درون شو آشنا وازبرون بیگانہ باش

ایں چنیں زیبا روش کمتر بو داند رجہان

"বাহ্যিক দৃষ্টিতে পর এবং অন্তরের দিক দিয়া আপন হইয়া থাক, এই পন্থায় সম্পর্ক গড়া এ জগতে খুবই বিরল।"

আমাদের দেওবন্দী বুজুর্গানের তরীকা দুই প্রকারই পরিলক্ষিত হয়।

একটা হইল হজরত শাহ্ আবদুর রহীম রায়পুরী (রঃ) এর তরীকা। তাঁহার ছেলেবেলার শুরু হইতেই আছবাবেরে লেশমাত্রও ছিল না।

দ্বিতীয় তরীকা ছিল অন্যান্য বুজুর্গানের অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় তাঁহারা আছবাবের সহিত সম্পর্ক যুক্ত ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী ধাপে আছবাবকে তরক করিতে থাকেন। হজরত হাজী এমদাদুল্লাহ (রহঃ) এর অবস্থাত আমাদের জানা নাই, তবে হজরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহঃ) প্রথম জীবনে চাকুরী করিতেন। 'তাজকেরাতুর রশীদ' গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, কোন একস্থান হইতে কোরান শরীফের তরজমা করার জন্য মাসিক সাত টাকা বেতনে প্রস্তাব আসিয়াছিল। হজরত হাজী ছাহেব হইতে যখন অনুমতি চাহিয়াছিলেন তিনি নিষেধ করিয়া বলিলেন, একটু অপেক্ষা কর আরও অধিক বেতনের সুযোগ আসিবে তার অল্প কিছু দিন পরেই ছাহারানপুরের বিখ্যাত সর্দার নবাব শায়েস্তা খান স্বীয় বাচ্চাদের তালীম দেওয়ার জন্য মাসিক দশ টাকা বেতনে তাহাকে নিয়োগ করেন। সেখানে তিনি ছয় মাস পর্যন্ত চাকুরী করেন। হজরত গঙ্গুহীর লিখিত 'হেদায়াতুশ শীয়াহ' গ্রন্থে পাওয়া যায়, তিনি কিতাবের ব্যবসাও করিতেন।

আমার পিতা হজরত গঙ্গুহী (রহঃ) এর খাছ শাগরেদ ও খাদেম ছিলেন। তিনি কিতাবের ব্যবসা করিতেন। সম্ভবতঃ হজরত গঙ্গুহী আব্বাজানের সহিত শেয়ারে ব্যবসা করিতেন।

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হজরত কাছেম নানাতবী (রঃ) প্রথম বয়সে তাঁহার উস্তাদ মাওলানা আহমদ আলী মিরঠীর ছাপাখানায় চাকুরী করিতেন তারপর দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর

তিনি মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ শুরু করেন, কিন্তু তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসা হইতে কখনও কোন বেতন গ্রহণ করেন নাই।

হজরত ছাহারানপুরী হজরত শায়খুল হিন্দ মাহ্মুদুল হাছান হজরত থানবী (রঃ) প্রমুখ বুজুর্গ প্রথম প্রথম মাদ্রাসায় শিক্ষকতার কাজ করিতেন অতঃপর সকলে উহা ছাড়িয়া দেন।

হজরতর হোছায়েন আহমদ মাদানী (রঃ) যদিও শেষ পর্যন্ত মাদ্রাসা হইতে বেতন গ্রহন করিতেন কিন্তু তাঁহার বিরাট দস্তরখান ও গোপন দান দাক্ষিণ্য এত অধিক ছিল যে, সামান্য বেতন দ্বারা উহার ক্ষুদ্রতম অংশও সঙ্কুলান হইত না।

আমার চাচাজান হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রঃ) প্রথম অবস্থায় ছাহারানপুর মাদ্রাসায় চাকুরী করিতেন। তারপর তিনি দিল্লী চলিয়া যান। একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, কয়েকবার ব্যবসা শুরু করিয়াছিলাম। এবং মেওয়াত ওয়ালাদের সাথে কয়েকবার বকরীও খরিদ করিয়াছিলাম। কিন্তু একশত পর্যন্ত পৌছার আগে আগেই মরিয়া যাইত। অবশেষে বাধ্য হইয়া ছাড়িয়া দিলাম।

স্বয়ং আমাদের প্রাণ প্রিয় বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ) কয়েকটি কীরাতের বিনিময়ে মক্কাওয়ালাদের বকরীও চারাইয়াছিলেন এবং নবুওতের পূর্বে হজরত খাদীজাতুল কোবরার মাল নিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন। কিন্তু নবুওয়তের পরে আর কোন ব্যবসা করেন নাই।

হজরত মুছা আলাইহিচ্ছাল্লাম দশ বৎসর যাবত চাকুরী হিসাবে হজরত শোয়ায়েব (আঃ) এর বকরী চরাইয়াছিলেন।

হজরত এব্নে আব্বাছ (রাঃ) কে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হজরত মুছা (আঃ) হজরত শোয়ায়েব (আঃ) এর বকরী কয় বৎসর চরাইয়াছিলেন? তিনি বলেন, যাহা বেশী উত্তম ও অধিক কার্যকরী তাহাই করিয়াছিলেন, অর্থাৎ দশ বৎসর।

উপার্জনের পন্থাসমূহ ও উহার মধ্যে উত্তম কোন্‌টা

উপার্জনের পন্থাসমূহ ও উহার মধ্যে কোন্‌টা সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা, আগেকার বুজুর্গানে দ্বীনের মধ্যে ঐ ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, জীবিকার জন্য সব চেয়ে উত্তম পন্থা হইল তেজারত। হজরত আবুল হাছান মাওদীর নিকট হইল কৃষিকাজ। ইমাম নববীর মতে নিজ হাতের উপার্জনই হইল সবচেয়ে উত্তম। উহার মধ্যে তিনি কৃষিকেও শামিল করিয়াছেন। ছাহেবে 'বাহার' বলেন, আমাদের হানাফী ওলামাদের মতে জেহাদের পর জীবিকার সবচেয়ে উত্তম রাস্তা হইল তেজারত, তারপর কৃষিকাজ, তারপর শিল্পকলা। আমার মতে রোজগারের পন্থা হইল তিনটা, ব্যবসা, কৃষি ও কেরায়া। প্রত্যেকটার ফজীলত সম্পর্কে অনেক অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে। কোন কোন বুজুর্গান কারিগরি এবং হস্ত শিল্পকেও উহার মধ্যে শামিল করিয়াছেন। আমার নিকট ইহা জীবিকার উপায় নয়, বরং আমদানীর আছবাব মাত্র। আর আমদানীর আছবাব অনেক প্রকার রহিয়াছে, হেবা, মীরাছ, ছদকা ইত্যাদি যাহারা এই সবকে উপার্জনের আছবার বর্ণনা করিয়াছেন আমার নিকট উহা ঠিক নহে। কেননা শুধু মাত্র শিল্পকলা উপর্জন নয়। যেহেতু এক ব্যক্তি জুতা বানাইতে জানে বা তার জুতা বানানোর কারখানা আছে, সে জুতা বানাইয়া বানাইয়া গুদাম ভর্তী করিয়া রাখিল ইহাতে তার আমদানী কি হইবে? হয়তঃ সে বিক্রী করিবে নতুবা নওকর হিসাবে বানাইবে; উভয় তরীকাই তেজারত অথবা ইজারার মধ্যে গণ্য হইয়া গেল, আবার তার চেয়ে গুরুতর ব্যাপার হইল জেহাদকে আমদানীর উছিলা সাব্যস্ত করা। কেননা জেহাদের মধ্যে যদি কামাই করার নিয়তই আসিয়া গেল তবে ত জেহাদই বাতেল হইয়া গেল। জনৈক ব্যক্তি প্রিয় হাবীবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ইয়া রাছুলাল্লাহ! এক ব্যক্তি জেহাদের জন্য বাহির হইল, তার সাথে সাথে কিছুটা পার্থিব ধন-সম্পদেরও আশা করিল, তার কি অবস্থা হইবে? প্রিয় নবী এরশাদ ফরমাইলেন, সে কোন প্রকার ছওয়াব পাইবে না। (আবু দাউদ)

অন্য একটি হাদীছে হজরত আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি প্রিয় নবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এক ব্যক্তি গনীমত লাভের আশায় জেহাদ করে, দ্বিতীয় ব্যক্তি নামের জন্য জেহাদ করিতেছে। তৃতীয় ব্যক্তি নিজ বীরত্ব দেখাইবার জন্য জেহাদ করিতেছে। প্রকৃত মুজাহেদ কাহাকে বলা যায়? হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম বুলন্দ করার নিয়তে জেহাদ করে তাহাকেই প্রকৃত পক্ষে মুজাহেদ ফী ছাবীলিল্লাহ বলা চলে। (মেশকাত ৩৩২ পৃঃ)

হজরত আবু ওমামা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি প্রিয় নবীকে জিজ্ঞাসা করেন ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে হুজুর কি বলেন, যে নিজের নাম কাম এবং গনীমতের মাল হাছেল করার জন্য জেহাদ করিয়া থাকে? তার উত্তরে প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেন, তাহার কোন ফায়েদা হইবে না। প্রশ্নকারী তিনবার এইভাবে জিজ্ঞাসা করেন ও হুজুর (ছঃ) তিনবার উত্তর দিতে থাকেন যে, তাহার কোন ফায়েদা হইবে না। অতঃপর হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা শুধু ঐ আমলকেই কবুল করিয়া থাকেন যাহা একমাত্র আল্লাহর জন্যই হইয়া থাকে এবং তাঁহার রেজামন্দীর জন্য করা যায়। (আবু দাউদ)

আমি প্রথমেই বর্ণনা করিয়াছি যে, পেশা হিসাবে মানুষের জন্য ব্যবসাই সবচেয়ে উত্তম। কেননা ব্যবসার মধ্যে মানুষ নিজ সময়কে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ব্যবসার ভিতর দিয়াও মানুষ তা'লীম, তাবলীগ, ফতুয়া ইত্যাদির কাজ করিতে পারে। সুতরাং চাকুরী যদি দ্বীনী কাজের জন্য হয় তবে উহা ব্যবসা হইতেও উত্তম। কেননা উহা প্রকৃত পক্ষে দ্বীনেরই কাজ। তবে শর্ত হইল, এ ক্ষেত্রে দ্বীন আসল উদ্দেশ্য হওয়া চাই এবং বেতন হওয়া চাই মজুরী স্বরূপ। আমার দেওবন্দী বুজুর্গানের অভ্যাস এইরূপই ছিল। তাঁহারা দ্বীনের কাজকে আসল মনে করিতেন ও বেতনকে আল্লাহর দান মনে করিতেন। এজন্যই তাঁহারা যখন শিক্ষকতা বা ফতুয়ার কাজে নিযুক্ত থাকিতেন তখন অন্য কোথাও অধিক বেতন পাইলে শুধু বেশী টাকার লোভে তাহা কবুল করিতেন না। আমি আমার বুজুর্গানদিগকে খুব

কঠোর ভাবে এই নিয়ম মানিয়া চলিতে দেখিয়াছি। "আ–প বীতি" গ্রন্থে হজরত ছাহারানপুরী এবং হজরত শায়খুল হিন্দ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত লিখিয়াছি। আমার ওস্তাদের মাজাহেরে উলুম মাদ্রাসায় আখেরী বেতন ছিল মাত্র চল্লিশ টাকা। হজরত শায়খুল হিন্দের দেওবন্দ মাদ্রাসায় আখেরী বেতন ছিল মাত্র পঞ্চাশ টাকা। এই উভয় বুজুর্গকে যখনই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বেতন বাড়াইবার জন্য প্রস্তাব দিতেন তখনই তাঁহারা এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেন যে, আমার যোগ্যতা হিসাবে বর্তমান বেতনই বেশী। উভয় মাদ্রাসায় সহকারী মোদাররেছের বেতন যখন তাঁহাদের বেতনের সমকক্ষ হইয়া যায় তখন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বলেন যে, আপনারা বেতন বাড়াইতে অস্বীকার করিলে নীচের মোদাররেছের তরক্কী বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে মজবুর হইয়া উভয় বুজুর্গ কিছু বেতন বাড়াইয়া নেন।

আমার শ্রদ্ধেয় বুজুর্গ হজরত মাওলানা খলিল আহমদ ছাহেব এক বৎসর হেজাজে অবস্থান করার পর ১৩৩৪ হিজরীর শেষ ভাগে মাজাহেরে উলুম মাদ্রাসায় ফিরিয়া আসেন। তখন আমার আব্বাজান মা–ওলানা ইয়াহ ইয়া ছাহেব জ্বিলক্বদ মাসে এন্তেকাল করেন। তিনি যখন বিদেশে ছিলেন তানার দাওরার কিতাব আব্বাজান পড়াইতেন। তিনি মাদ্রাসা হইতে কোন বেতন গ্রহন করিতেন না। এবারে মাওলানা খলিল আহমদ ছাহেবও লিখিতভাবে প্রস্তাব দিলেন যে, যেহেতু বার্দ্ধক্যের দরুন পড়ানোর পুরা হক আদায় করিতে পারেন না তাই তিনি মাদ্রাসা হইতে কোন বেতন নেবেন না। হজরত রায়পুরী (রঃ) অনেক খোসামদ তোশামদ করিয়া বলিলেন, হজরত! মাদ্রাসার এন্তেজামের ব্যাপারে আপনার প্রয়োজন অপরিসীম, কাজেই শিক্ষকতার জন্য না হইলেও এন্তেজামের জন্য আপনাকে কিছু বেতন নিতেই হইবে। হজরত থানবী (রহঃ) ও এই ব্যাপারে সুপারিশ করেন। সেই সময় হজরত শায়খুল হিন্দ (রহঃ) মালটা দ্বীপে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। এই তিনজনই মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

হজরত কাছেম নানুতুবী (রঃ) এর ঘটনা

বিশ্ব বিখ্যাত ইছলামী প্রতিষ্ঠান দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হজরত মাওলানা কাছেম (রহঃ) এর খেদমতে আলীগড়ের বিখ্যাত ধনাঢ্য ব্যক্তি মৌঃ ইছমাইল একটা পত্র লেখেন। পত্রে উল্লেখ করেন যে, হজরত আপনি মেহেরমানী পূর্বক একজন বিশ্বস্ত আলেম পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন, যাঁহার নিকট আমি হাদীছ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারি। হজরত মাওলানা এই বলিয়া উত্তর লিখিলেন যে, অন্য বড় বড় আলেমদের সুযোগ কোথায়? তবে আপনি যদি পছন্দ করেন তা হইলে এই অধম ফকীর কাছেমই আপনার খেদমত করার জন্য প্রস্তুত। মৌলবী ইছমাইল এই সুসংবাদ শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। অবশেষে হজরত স্বয়ং ইছমাইল ছাহেবকে পড়াইবার জন্য আলীগড় উপস্থিত হইলেন এবং যেই যেই কিতাব পড়িতে চাহিলেন ঐগুলি পড়াইতে লাগিলেন। বেতনের প্রশ্ন যখন উত্থাপিত হইল মৌঃ ইছমাইল কারজোড়ে বলিলেন, হজরত যাহা প্রস্তাব করেন বান্দা তাহাই দিবার জন্য তৈয়ার। হজরত শর্ত করিলেন আমি যাহা বলি তুমি তাহার উপর কোন কথা বলিতে পারিবেনা। অবশেষে হজরত বলিলেন আমি যতদিন তোমার এখানে থাকিব আমাকে বাড়ী পাঠাইবার জন্য মাত্র পনের টাকা বেতন দিবে। ইহাতে মৌঃ ইছমাইল খুব লজ্জিত হইয়া গেল। কিন্তু পূর্বের শর্ত অনুসারে কোন কিছুই বলিবার উপায় ছিলনা। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন যখন মৌলবী ইছমাইল পড়িতে আসেন তখন হযরত কাছেম (রঃ) তাহাকে বলিলেন, ভাই, বেতন সম্পর্কে আজ তোমার সাথে একটা পুনর্বিবেচনার কথা হইবে। মৌলবী সাহেব শুনিয়া খুবই আনন্দিত হইলেন এই ভাবিয়া যে হয়তঃ হজরতের বেতন কিছু বাড়াইয়া দেওয়া যাইবে। কিন্তু কথাবার্তার সময় বলিলেন, ভাই তোমার পনের টাকা হইতে আমি দশ টাকা পরিবারের জন্য ও পাঁচ টাকা আমার আম্মার জন্য পাঠাইতাম। গতকাল পত্রে জানিতে পারিলাম যে, আমার আম্মা এন্তেকাল করিয়া গিয়াছেন কাজেই আমাকে এখন হইতে আর পাঁচ টাকা দিতে হইবে না। পনের টাকার স্থলে

শুধু দশ টাকা দিলেই চলিবে। মৌঃ ইছমাইল এই কথা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলেন এবং বারংবার বলিতে লাগিলেন, হজরত আমার কোন প্রকার কষ্ট হয় না। কিন্তু তিনি খুব কঠোরভাবে বলিলেন, অপ্রয়োজনে আমি টাকার বোঝা কেন উঠাইব? অবশেষে দশ টাকার উপরই সিদ্ধান্ত হইল। অবশ্য কারী সাহেব যিনি এই ঘটনা নবাব ছদর ইয়ারে জঙ্গের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন ঘটনার শেষাংশে তিনি সন্দেহ পোষণ করিতেন। হজরত কারী সাহেব বলিতেন কিতাবের প্রুফ দেখা এবং ছহী শুদ্ধ করার বিনিময় ছাড়া পড়া লেখার বিনিময়ে তিনি কখনও বেতন গ্রহণ করেন নাই। দেওবন্দের সমস্ত বুজুর্গান এ বিষয়ে একমত। (আ–প বীতি)

"আরওয়াহে ছালাছা" গ্রন্থে বর্ণিত আছে, আমীরুদ্দীন ছাহেব বলেন, একবার ভূপাল ষ্টেট হইতে মাওলানা কাছেমের নিকট মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে প্রস্তাব আসিয়াছিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম আরে কাছেম। তুমি যাইতেছ না কেন? তিনি উত্তর করিলেন তাহারাত আমাকে খুব বেশী উপযুক্ত মনে করিয়া ডাকিতেছে অথচ আমি ত আমার মধ্যে কোন উপযুক্ততা দেখিতেছিনা। কাজেই আমি কেন যাইব? আমি অনেক বেশী অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি যান নাই।

প্রকৃত পক্ষে আমার বুজুর্গানদের বহু ঘটাবলী হইতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা বেতনকে কখনও আসল উদ্দেশ্য মনে করিতেন না বরং উহাকে আল্লাহর দান হিসাবে গ্রহণ করিতেন– সেই ধ্যান ধারনার লেশ মাত্রও আমাদের মধ্যে নেই। এই জন্যই আমি তা'লীমের এজারা অর্থাৎ বেতনকে জীবিকার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছি। তবে আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীছে উহার পরিপন্থী দেখা যায়, যেমন–

হজরত ওবাদা বিন ছামেত (রাঃ) বলেন, আমি আহলে ছোফফার কয়েকজন লোককে কোরান শরীফ পড়াইয়াছিলাম। তন্মধ্যে জনৈক ব্যক্তি আমাকে একটি তীরের কামান হাদিয়া স্বরুপ দান করিয়াছিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম ইহাত কোন কাজের নয়, ইহা জেহাদের ময়দানে

আমার কাজে আসিবে, তবু আমি মনে করিলাম, আমি প্রিয়নবী (ছঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়া নিব। সুতরাং আমি হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম এক ব্যক্তি আমাকে তাহাকে কোরান পড়াইবার বিনিময়ে একটা তীরের কামান দান করিয়াছে। ইহাত কোন মাল নয়। ইহা দ্বারা আমি যুদ্ধের ময়দানে তীর মারিতে পারিব। শুনিয়া প্রিয় মাহবুব (ছঃ) এরশাদ করেন, তুমি যদি আগুনের একটা জিঞ্জির গলায় পরিতে চাও তবে উহা কবুল করিতে পার। (আবু দাউদ)

এই হাদীছের উপর ভিত্তি করিয়া তা'লীম দিয়া পয়সা লওয়া জায়েজ কি না এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ পয়দা হইয়াছে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের নিকট তালীম দিয়া বেতন লওয়া নাজায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন জায়েজ। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল জায়েজ নাজায়েজ দুই প্রকার ফতুয়া দিয়াছেন। হানাফী মাজহাবের পরবর্তী ওলামাগণের মতে প্রয়োজনের তাকীদে বেতন লওয়া জায়েজ। যাহারা জায়েজ বলিয়া ফতুয়া দিয়াছেন তাহারা প্রমাণ স্বরূপ হজরত ছহল বিন ছায়াদের হাদীছ পেশ করেন। হাদীছ হইল এই যে, একদিন প্রিয়নবীর দরবারে জনৈক মহিলা আসিয়া আরজ করিল, হুজুর আপনি আমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করুন। হুজুর (ছঃ) চুপ করিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মেয়েলোকটি দাঁড়াইয়া রহিল, তখন একজন ছাহাবী আরজ করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ। মেয়েলোকটা যদি আপনার পছন্দসই না হয় তবে তাহাকে আমার নেকাহতে সপর্দ করুন। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, মোহর দেওয়ার মত তোমার নিকট কি আছে? লোকটি বলিল, হুজুর আমার লুঙ্গি ছাড়া আর কোন বস্তু নাই। হুজুর বলেন, তোমার লুঙ্গিটা দিয়া দিলে তুমি লুঙ্গি ব্যতীতই থাকিবে নাকি? তাই অন্য কিছু আছে কিনা তালাশ করিয়া দেখ। লোকটি বলিল আমার কাছেত আর কিছুই নাই। হুজুর (ছঃ) আবার বলেন তালাশ করিয়া দেখ একটা লোহার আংটি হইলেও চলিবে। লোকটি তালাশ করিয়া কিছুই পাইল না। অবশেষে হুজুর (ছঃ) বলিলেন, তুমি কি কোরান শরীফের কিছু অংশ মুখস্থ জান? ছাহাবী আরজ করিল, জী—হ্যাঁ

অমুক ছুরা আমার মুখস্থ আছে। হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন, তুমি কোরানে পাকের যতটুকু জান অতটুক তাহাকে শিখাইবে এই শর্তের উপর মহিলাটিকে তোমার নেকাহতে সপর্দ করিলাম।

ছুরায়ে ফাতেহার দ্বারা ঝাড়ফুঁক করার ব্যাপারে হুজুরে পাক (ছঃ) এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি বাতেল ঝাড়ফুঁক করিয়া খাইল সেত অন্যায় করিল, তুমি ন্যায় সঙ্গত ভাবে ঝাড়ফুঁক করিয়া খাইয়াছ। এই প্রসঙ্গে অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে বদলা লওয়ার সবচেয়ে বড় উপযুক্ত বস্তু হইল আল্লাহ্‌র কিতাব।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, কোরানের দ্বারা ঝাড়ফুঁক করিয়া পয়সা লওয়া জায়েজ। ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। কোরান পড়াইয়া এবং উহা লিখিয়া পয়সা লওয়াও জায়েজ। যদিও আলেমগণ এ বিষয়ে এখ্‌তেলাফ করিয়াছেন।

হজরত শায়খুল হাদীছ বলেন, আমার অভিমত হইল এই যে, হুজুরে পাক (ছঃ) এর জমানায় তাওয়াক্কুল এবং দরবেশী অনেক উচ্চ পর্যায়ের ছিল যার কিছুটা দৃষ্টান্ত উপরে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বীনদার তরিকার মধ্যে বখ্‌শিশ ও দানের প্রাচুর্য ছিল। বায়তুল মালের ছিলছিলা জারী ছিল। এই জন্যই সেই জমানায় দ্বীনী খেদমত করনেওয়ালাদের জন্য পয়সা গ্রহণ করা নিষেধ হইলেও কোন অসুবিধা ছিল না। শেষ জমানার লোকদের মধ্যে বয়তুল মালের ছিলছিলা নাই এবং মানুষের মধ্যে সাধারণভাবে পরহেজগারী এবং তাওয়াক্কুল নাই বলিলেই চলে। এই জন্যই বেতন ব্যতীত দ্বীনের কাজ করা মুশকিল হইয়া পড়িয়াছে। শেফাউল আলীল গ্রন্থেও আমার এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

"মোহাম্মদ বিন্ ফজল বলেন, প্রাথমিক যুগের ওলামাগণ কোরান শরীফ পড়াইয়া বেতন নেওয়াকে এই জন্য অন্যায় মনে করিতেন যে, সেই জমানায় বায়তুল মাল হইতে তাঁহারা বৃত্তি পাইতেন। এবং দ্বীনের কাজের প্রতি মানুষেরও খুব উৎসাহ ছিল। আর আমাদের এই জমানায় ঐ সব বিলুপ্ত প্রায়।"

বরং আমার ত কয়েক বৎসর যাবত অভ্যাস মাদ্রাসাওয়ালাদেরকে বলিয়া থাকি বেতন ব্যতীত কোন মোদাররেছই যেন না রাখা হয়। কেননা বেতন করা মোদাররেছ যেই মনোযোগের সহিত পড়াইয়া থাকে অবৈতনিক মোদাররেছ সেইরূপ কখনও পড়ায় না। আমার নিজ অভিজ্ঞতায়ও দেখিয়াছি, যেই সব শিক্ষককে দুই এক ঘন্টা মাদ্রাসায় পড়াইয়া বাকী সময় ব্যবসা করার জন্য আমি পরামর্শ দিয়াছিলাম তাহারা অল্পদিন পরেই মাদ্রাসার কাজে অমনোযোগী হইয়া ব্যবসায়ে অধিক মনোযোগ দিতে শুরু করিয়াছে। তবে পূর্ব কালের আলেমদের কথা হইল স্বতন্ত্র, তাঁহাদের তাওয়াক্কুল এত প্রবল ছিল তাঁহারা ব্যবসার সহিত দ্বীনের কাজ যে করিতেন তাঁহাদের দ্বীনের কাজই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। আর ব্যবসা ছিল শুধু মাত্র প্রয়োজন মিটাইবার জন্য। কিন্তু এ জমানায় যদি উভয় কাজ শুরু করা হয় তবে তেজারতের স্পৃহা এত বাড়িয়া যায় যে তা'লীমের কাজে তাদের আর কোন মনোযোগই থাকে না। এই জন্য আমি দ্বীনী তা'লীমের সহিত দুনিয়াবী শিল্পকলাকে দাখিল করারও বিরোধী। কারণ ইহাতেও দ্বীনের আসল রুহ বরবাদ হইয়া যায়। মাওলানা রুমী বলেন –

کار پاکان راقیاس از خود مگیر –

گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر –

অর্থাৎ যাহারা পূত পবিত্র তাহাদের সহিত নিজেদের তুলনা করিও না, যদিও লিখিবার বেলায় ফার্সিতে শের ও শির এক রকম বলিয়া মনে হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এক নয়। (অর্থাৎ শের অর্থ বাঘ এবং শির অর্থ দুধ।)

অতএব আগের জামানার ওলামাদের সহিত এই জমানার ওলামাদের তুলনাও হয় না, উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ সব বুজুর্গানের সমকক্ষ তাওয়াক্কুল এবং দরবেশী হাছেল না করিবে ততক্ষণ শুধু বাহ্যিক দিক দেখিয়া তাহাদের মত পন্থা অবলম্বন করা উচিৎ নয়। হ্যাঁ যখন সেই মর্যাদায় পৌঁছিয়া যাইবে এবং নিজের উপর দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া যাইবে যে, এখন দ্বীনের খেদমত এবং তেজারত উভয়

কাজকেই সামলানো যাইবে তখন কিন্তু উভয়টা করাই উত্তম। এই কারণেই আমাদের বুজুর্গানের দস্তুরও তাহাই ছিল। যেমন হজরত গঙ্গুহী (রঃ) প্রথম অবস্থায় ছাহারানপুর মাদ্রাসায় দশ টাকা বেতনে চাকুরী করেন ও বাচ্চাদেরকে পড়ান। হজরত কাছেম নানুতবী (রঃ) কিছুদিন হাদীছ পড়াইয়া ও কিতাব শুদ্ধ করিয়া বেতন গ্রহণ করেন। হজরত থানবী (রঃ) কানপুরে চাকুরী করিয়াছিলেন। পরে হজরত গঙ্গুহীর দরবারে চিঠির মারফত চাকুরী ছাড়িয়া দিবার জন্য পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। হজরত গঙ্গুহীকে তিনবার চিঠি লেখেন। তিনবারই তিনি নিষেধ করেন। চতুর্থবার চাকুরী ছাড়িয়া থানাভুন আসিয়া হজরতের নিকট যখন পত্র লেখেন হজরত ইহাতে খুব বেশী আনন্দিত হন ও দোয়া করেন। এবং পত্র লিখিয়া জানাইয়া দেন যে, ইনশাল্লাহ রুজীর জন্য কোন পেরেশান হইবে না। আমার আব্বাজান হজরত গঙ্গুহীর চিঠি পত্র লিখিতেন, তিনি জিজ্ঞাসা করেন হজরত! প্রথমে তিনবার নিষেধ করিলেন আর এবার খুশী হইয়া তাঁহাকে দোয়া করিলেন? উত্তরে হজরত বলেন, পরামর্শ ঐ ব্যক্তি চায় যার মনের মধ্যে পেরেশানী থাকে, আর যখন মনে স্থিরতা আসিয়া যায় তখন আর মোশওয়ারা করে না।

'মাজালেছে হাকীমুল উম্মত' গ্রন্থে মুফতী মোহম্মদ শফী ছাহেব লিখিয়াছেন, কানপুরে চাকুরী ছাড়ার পর হজরত থানবী থানাভুন খান্কাহ শরীফে তাওয়াক্কুলের জিন্দেগী অতিবাহিত করিতেন। তখন পারিবারিক খরচের চাপে একবার দেড় শত টাকা পর্যন্ত কর্জ হইয়া গিয়াছিল। সেই সময় হজরত হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব এন্তেকাল করিয়া যান, কাজেই হাজী সাহেবের স্থলে হজরত গঙ্গুহীর দরবারে নিজের হাল অবস্থা জানাইয়া দোয়ার জন্য লেখেন। হজরত গঙ্গুহী উত্তরে লেখন দেওবন্দ মাদ্রাসায় একটা পদ খালী হইয়াছে। তোমার অনুমতি পাইলে আমি তাহাদিগকে লিখিয়া দিতে পারি। হজরত থানবী পত্র পাইয়া বড় বিপাকে পড়িয়া যান। কেননা যদি চাকুরী করেন, হজরত হাজী সাহেবের কথা অমান্য করা হয়। (যেহেতু তিনি বলিয়াছিলেন, কানপুরের পর আর কোন চাকুরী করিও না)। আর যদি চাকুরী না করেন, হজরত গঙ্গুহীর সহিত

বলিবেন, তুমি মিথ্যাবাদী। হ্যাঁ এলেম এই জন্য শিখিয়াছিলে যে, লোকে তোমাকে আলেম বলিবে এবং কোরানে পাক এই জন্য পড়িয়াছিলে যে, মানুষ তোমাকে ক্বারী বলিবে, উহাত বলা হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা হুকুম করিবেন, তখন তাহাকে অধঃমুখী করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

তৃতীয় বার একজন ধনী ব্যক্তিকে আনা হইবে। যাহাকে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন প্রকার ধনসম্পদ দান করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা যখন তাহাকে বিভিন্ন প্রকার ধন সম্পদের বর্ণনা দিবেন তখন সে সব কিছুই স্বীকার করিবে। আল্লাহ পাক বলিবেন, ঐসবের মোকাবেলায় তুমি কি কি নেক কাজ করিয়াছ? সে বলিবে, এমন কোন রাস্তা নেই যেখানে আমি খরচ করি নাই। আল্লাহ পাক বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। হ্যাঁ তুমি ঐসব এই জন্য করিয়াছিলে যে, লোকে তোমাকে বড় দানবীর বলিবে। তারপর হুকুম করা হইবে ও সেই ব্যক্তিকে অধঃমুখী করিয়া টানা হেঁছড়া করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইবে। (মেশ্‌কাত)

অথচ এলেমের মত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু, শাহাদত এবং ছাখাওয়াতের মত বুজুর্গ ও গুরুত্বপূর্ণ আমল শুধু মাত্র বদনিয়তির কারণে বরবাদ হইয়া গেল এবং সর্বপ্রথমে তাহাদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

বেচা-কেনা তেজারতের এতসব ফজীলত থাকা সত্ত্বেও যদি উহার সহিত সুদ আসিয়া মিশ্রিত হয় তবে ছওয়াবের পরিবর্তে কত বড় আজাবের যোগ্য হইয়া যায়। শাহাদাত এবং এলেমের ফজিলত সর্বজন বিদিত। উহাদের ফজীলতে কতশত আয়াত এবং হাদীছ বর্ণিত আছে, কিন্তু নিয়ত খারাপ হওয়ার দরুণ সর্বাগ্রে তাহারাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

ইজারারও যথেষ্ট ফজীলত বর্নিত আছে, কিন্তু উহার সময়সীমার ব্যাপারে যদি কিছু ত্রুটি হইয়া যায় তবে উহা জানের উপর বিপদ হইয়া দাঁড়ায়।

হজরত মাওলানা মাজহার নানুতবী (রহঃ) সম্পর্কে খ্যাতি আছে যে, মাদ্রাসায় পড়া লেখার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি ব্যক্তিগত কাজের জন্য কেহ আসিত তবে তিনি চুপে চুপে ঘন্টা দেখিয়া নিতেন এবং লোকটি

চলিয়া যাইবার পর দ্বিতীয়বার ঘন্টা দেখিয়া যত মিনিট উহাতে ব্যয় হইয়াছে নোট করিয়া লইতেন এবং মাসের শেষ দিকে সব একত্র করিয়া সেই পরিমাণ সময়ের বেতন না নিয়া বাকীটুকু গ্রহণ করিতেন।

হজরত মাওলানা কাছেম নানু'তবী (রঃ) মীরঠে মুন্সি মোমতাজ আলী ছাহেবের ছাপাখানায় কাজ করিতেন। কোন কোন সময় প্রেসে আসিতে যদি হজরতের দুই এক মিনিট বিলম্ব হইয়া যাইত বা নিদৃষ্ট সময়ের মধ্য ভাগে বা শেষ ভাগেও যদি ওজর বশতঃ কিছু সময় নষ্ট হইয়া যাইত তবে তিনি ঐ সমস্ত মিনিটগুলি নোট করিয়া রাখিতেন, মাসের শেষে বেতন নেওয়ার সময় সেই পরিমাণ সময়ের বেতন তিনি কিছুতেই গ্রহণ করিতেন না।

হজরত শায়খুল হাদীছ ছাহেব এরশাদ করেন, আমার শ্রদ্ধেয় মোর্শেদ হজরত ছাহারানপুরী (রহঃ) এক বৎসর হেজাজের ছফরে কাটাইয়া যখন ১৩৩৪ হিজরীতে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আমার আব্বাজান এন্তেকাল করিয়া যান। ছাহারানপুরী ছাহেবের অনুপুস্থিতিতে আব্বাজান তাঁহার হাদীছের কিতাব পড়াইতেন, কিন্তু তিনি বেতন নিতেন না। হজরতও দেশে ফিরিয়া সেই সময়ের বেতন গ্রহণ করেন নাই।

শায়খুল ইছলাম হজরত মাদানী (রহঃ) হজ্বে যখন যাইতেন তখন যেহেতু মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থাকিতেন কাজেই উক্ত সময়ের বেতন তিনি কবুল করিতেন না। একবার তিনি অসুস্থাবস্থায় মাদ্রাসা হইতে এক মাসের ছুটি নিয়াছিলেন। মাদ্রাসার কানুন মোতাবেক সেই মাসের বেতন যখন তাঁহার খেদমতে পেশ করা হয় তিনি বলেন, আমি যখন পড়াই নাই বেতন কি করিয়া নিব? তাঁহার এন্তেকালের পর সেই বেতন তাঁহার বিবির খেতমতে পেশ করা হইলে তিনিও এই বলিয়া ফেরত দেন যে, হজরত যখন জীবদ্দশায় উহা গ্রহণ করেন নাই আমি উহা কি করিয়া গ্রহণ করিতে পারি? হজরত মাদানী (রহ্ঃ) ১৩৪৫ হিজরীতে যখন দেওবন্দ মাদ্রাসার হেড মাওলানা নিযুক্ত হন তখন তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট বিশটা শর্ত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উনিশ নম্বর শর্ত ছিল– মাদ্রাসার খেদমতের সময় আমার যদি কোন ত্রুটি হয় তবে বাধ্যতামূলক ভাবে আমার বেতন হইতে সেই সময়টুকুর অংশ কাটিয়া রাখিতে হইবে।

এক প্রকার বেয়াদবী হয়। কিন্তু আল্লাহ পাক সঠিক উত্তর অন্তরে ঢালিয়া দিলেন। আমি লিখিলাম হজরত! আমার পত্রের দ্বারা কোন চাকুরী বা জীবিকার ব্যবস্থা উদ্দেশ্য ছিল না বরং শুধু দোয়ার প্রার্থনা ছিল। কেননা হজরত হাজী সাহেব কানপুরের পর আর কোন চাকুরী করিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছেন। বর্তমানে হজুর হইলেন হজরত হাজী সাহেবের স্থলাভিসিক্ত, কাজেই হজরত যদি এরশাদ করেন তবে মনে করিব হাজী সাহেবের হুকুম বাতেল হইয়া গিয়াছে। আমি, নির্দ্বিধায় চাকুরী কবুল করিব। ইহার পর হজরত গঙ্গুহী উত্তর দিলেন, তোমাকে আর কোন চাকুরী করিতে হইবে না। ইনশা'ল্লাহ তোমার পেরেশানী চলিয়া যাইবে।

'মাজালেছে হাকীমুল উম্মত' গ্রন্থের অন্য জায়গায় হজরত কাছেম নানুতবী সম্পর্কে লিখিত আছে।

হজরত কাছেম (রহঃ) এর এলমী ও আমলী বুজুর্গী সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নয় সম্ভবতঃ এমন মুছলমান কমই আছে। তিনি নিজেকে এত ক্ষুদ্র মনে করিতেন যে, জীবিকার তাকীদে একবার তিনি দিল্লীর মোজতাবায়ী ছাপা খানায় মাত্র দশ টাকা বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন। একবার বেতন সম্পর্কে মনে একটু খটকা আসা মাত্রই হজরত হাজী সাহেবের নিকট পরামর্শ চাহিলেন যে, যেই বেতন গ্রহণ করিতেছি উহা না লইয়া শুধু লিল্লাহ করিব নাকি? হজরত হাজী সাহেব জমানার ইমাম ছিলেন; বলিলেন, আপনি বেতন না নেওয়ার পরামর্শ চাহিয়াছেন, ইহাতেই প্রমাণিত হয়, আপনার মনে পেরেশানী আছে। আর এই অবস্থায় আছবাব পরিহার করা ঠিক হইবে না। আছবাব ঐ সময় তরক করা যায় যখন মানুষ আপনভোলা হইয়া যায়।

কথিত আছে যে, হজরত হাজী সাহেব স্বয়ং মোতাওয়াক্কেল ছিলেন। অভাব অনটনের কঠিন মঞ্জিল তিনি অতিক্রম করেন। কিন্তু নিজের মুরীদানদিগকে শুধু মাত্র তাওয়াক্কুলের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে কঠোর ভাবে নিষেধ করিতেন।

'মাক্তুবাতে এমদাদিয়া' গ্রন্থে স্বয়ং হাজী এমদাদুল্লাহ (রঃ) হজরত থানবীকে লিখিয়াছেন- "কর্মহীনতা ও সংশ্রবহীনতা সমীচীন নয়। কেননা একাকী জীবন ব্যতীত উহা কখনও সঙ্গত নয়। পরিবার পরিজনকে পেরেশানীতে নিক্ষেপ করা অদুরদর্শিতার পরিচয়, আল্লাহ্র মাখলুককে দ্বীনী ফয়েজ পৌছান আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। এবং কখনো কখনো প্রিয় মাওলানা রশীদ আহমদের খেদমতে হাজীর হইবে এবং নিজের হাল হক্বীক্বত তাহার কানে পৌছাইবে, ইন্শাল্লাহ্ অনেক ফায়েদা হইবে।"

ইহার উপর ভিত্তি করিয়া হজরত থানবী (রঃ) লিখিয়াছেন, যাহার মধ্যে রিয়াজত ও মোজাহাদার দ্বারা তাওয়াক্কুলের পূর্ণ শক্তি অর্জিত না হয় তাহার জন্য কখনও জাহেরী জীবিকার উপকরণ সমূহ ত্যাগ করা উচিত হইবে না। কেননা ইহা দ্বারা সে স্বীয় নফছকে ভীষণ পেরেশানী ও আল্লাহ্র হুকুমের উপর সন্দেহ ভাজন করিয়া তুলিবে। পেরেশানী অবস্থায় কোন কাজই করা দুরস্ত নাই। খাছ করিয়া বাতেনী হালত যাহা সম্পূর্ণ রূপে মানসিক স্থিরতার উপর নির্ভর করে। হ্যাঁ যখন অন্তরের মধ্যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করার পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন হয় তখন আছবাব বর্জন করা জায়েজ। কিন্তু মনে রাখিবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এইগুণে গুণান্বিত হওয়ার উপর নিজের পুরোপরি পরীক্ষা হইয়া না যায় ততক্ষণ এব্যাপারে তাড়াহুড়া করিবে না। তদুপরি স্বীয় মোর্শেদের অনুমতি ত লইতেই হইবে।

তেজারতের ফজীলত ও উহা করার সঠিক তরীকা

দ্বীনী কাজে চাকুরী করার পরেই জীবিকার সবচেয়ে উত্তম পন্থা হইল তেজারত বা ব্যবসা। কেননা ব্যবসায়ীরা নিজেদের সময়কে নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহারা ব্যবসার সাথে সাথে অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষা দীক্ষা ও তাবলীগের কাজ করিতে পারে। ইহা ছাড়া তেজারতের ফজিলতে অনেক আয়াত এবং হাদীছ রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ পাক বলিতেছেন।

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ-

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের জান এবং মাল খরিদ করিয়া নিয়াছেন এবং উহার বিনিময়ে তাহাদের জন্য বেহেশ্‌তের ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে-

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

"সৎ আমানতদার ব্যবসায়ী কেয়ামতের দিন নবী, ছিদ্দীক শহীদগনের সহিত থাকিবে।" (তিরমিজি)

হুজুরে পাক (ছ ঃ) আরও এরশাদ করেন-

اِنَّ اَطْيَبَ الْكَسْبِ كَسْبُ التُّجَّارِ الَّذِيْنَ اِذَا حَدَّثُوْا لَمْ يَكْذِبُوْا وَاِذَا اؤْتُمِنُوْا لَمْ يَخُوْنُوْا وَاِذَا وَعَدُوْا لَمْ يُخْلِفُوْا وَاِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَذُمُّوْا وَاِذَا بَاعُوْا لَمْ يَمْدَحُوْا وَاِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوْا وَاِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوْا-

ترغيب

অর্থঃ সবেচেয়ে উত্তম উপার্জন ঐ সব ব্যবসায়ীর উপার্জন যাহারা মিথ্যা কথা বলে না, আমানতে খেয়ানত করে না, ওয়াদা করিয়া তাহা ভঙ্গ করে না, খরিদ করার সময় (বিক্রেতা কম মূল্যে বিক্রি করিবে এই আশায়) সেই জিনিসের খারাবী বর্ণনা করে না, আর যখন নিজে কোন বস্তু বিক্রি করে তখন (উহার অধিক মূল্যে পাওয়ার আশায়) উহার বেশী বেশী প্রশংসা করে না, এবং তাহার নিকট অন্য কেহ পাওনা হইলে উহা আদায়

করার ব্যাপারে টাল বাহানা করে না আবার নিজে যদি অন্যের কাছে কিছু পাওনা হয় তবে উহা উসুল করার ব্যাপারে খুব বেশী কড়াকড়ি করে না।

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

হজরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, সত্যবাদী ব্যবসায়ী কেয়ামতের দিবস আরশের ছায়ায় থাকিবে। (তারগীব)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ التَّاجِرَ اِذَا كَانَ فِيْهِ اَرْبَعُ خِصَالٍ طَابَ كَسْبُهٗ اِذَا اشْتَرٰى لَمْ يَذُمَّ وَاِذَا بَاعَ لَمْ يَمْدَحْ وَلَمْ يُدَلِّسْ فِى الْبَيْعِ وَلَمْ يَحْلِفْ فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ - ترغيب

হজরত আবু ওমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন, ব্যবসায়ীর মধ্যে যখন চারটি অভ্যাস আসিয়া যায় তখন তাহার কামাই রোজগার সব পবিত্র হইয়া যায়। খরিদ করার সময় সেই বস্তুর বদনাম করে না। আর বিক্রি করার সময় জিনিসের খুব প্রশংসা করে না, এবং বেচাকেনার সময় গড়বড় করে না ও কেনা কাটায় কছম খায়না। (তারগীব)

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَزَامٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا الْبَيِّعَانِ وَبَيَّنَا بُوْرِكَ

لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما - بخاري ومسلم

হজরত হাকীম বিন হাজাম হইতে বর্ণিত আছে, হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন ক্রেতা-বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের মোয়ামেলাকে বাতেল করিয়া দিতে পারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপন স্থান হইতে সরিয়া না পড়ে। ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি কেনাকাটায় সত্য কথা বলে এবং মাল ও মূল্যের ভাল-মন্দ বর্ণনা করিয়া দেয় তবে তাহাদের বেচাকেনায় বরকত হয় আর যদি দোষত্রুটি গোপন করিয়া রাখে এবং মিথ্যা গুণাবলী বর্ণনা করে তবে হইতে পারে কিছু লাভ হাছেল করিয়া লইবে কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের বরকতকে ধ্বংস করিয়া দিবে।

হজরত নাঈম বিন আবদুর রহমান এবং ইয়াহইয়া বিন জাবের হইতে বর্ণিত আছে যে, রিজিকের দশভাগের নয় ভাগ ব্যবসায়ের মধ্যে নিহিত আর এক অংশ পশু পালনের মধ্যে।

হজরত এবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তোমাদিগকে আমি ব্যবসায়ীদের সহিত সদ্ব্যবহার করার অছিয়ত করিতেছি কেননা তাহারা জমিনের বুকে আল্লাহ পাকের আমানতদার স্বরূপ।

হজরত ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা ব্যবসা বাণিজ্যকে খুব জরুরী মনে কর, মনে রাখিবে।; দুনিয়ার ব্যাপারে লাল রং এর লোকেরা অর্থাৎ ইউরোপের অধিবাসীরা তোমাদের উপর যেন প্রাধান্য বিস্তার করিতে না পারে।

হজরত ইমাম আশহাব মালেকী (রহঃ) বলেন, কোরেশ বংশের লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্য করিত আর আরবের অন্যান্য লোকেরা ব্যবসাকে ঘৃণা করিত। লাল রং এর লোক অর্থ আরবের বাহিরের লোকজন যাহাদের রং সাধারণতঃ লাল হইত।

হজরত ওমর (রাঃ) একবার বাজারে গিয়া দেখিলেন, বেশীর ভাগ ব্যবসায়ী বহিরাগত লোক এবং সাধারণ মানুষ। ইহা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া

পড়িলেন ও যখন খাছ খাছ লোকদের সমাবেশ হইয়াছিল তখন তিনি তাহাদের নিকট এ বিষয় আলোচনা করেন। উপস্থিত লোকজন আরজ করিল, আল্লাহ তায়ালা ইসলামের বিজয়ের দরুন গনিমতের মালের প্রাচুর্য্যে আমাদিগকে ব্যবসা হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছে। হজরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যদি এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকে তবে তোমাদের পুরুষগণ তাহাদের পুরুষদের ও তোমাদের নারিগণ তাহাদের নারীদের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িবে।

আল্লামা আবদুল হাই কাত্তানী বলেন, হজরত ওমরের দূরদর্শিতা এই উম্মতের ব্যাপারে একেবারেই সঠিক সাব্যস্ত হইয়াছে। কেননা যখন এই উম্মত শরীয়ত মোতাবেক বাণিজ্যকে পরিত্যাগ করিয়াছে তখন উহাকে অন্যান্য জাতি অবলম্বন করিয়া লইয়াছে আর মুসলিম জাতি বিজাতিদের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। সামান্য বস্তু এবং বড় বড় বস্তু সবাইর জন্য অন্যের দ্বারস্থ হইয়া পড়িয়াছে।

তিরমিজি শরীফে হজরত ছখর গামেদীর (রাঃ) একটা হাদীছ বর্ণিত আছে যে, হুজুরে পাক (ছঃ) এই দোয়া করিতেন, "আল্লাহুম্মা বা-রিক লে উম্মতী ফী বকুরেহা" অর্থাৎ হে খোদা! তুমি আমার উম্মতের জন্য প্রাতঃকালীন কাজে বরকত দিয়ে দাও। হজরত ছখর ইহাও বলিয়াছেন, প্রিয়নবী (ছঃ) যখন কোন বাহিনী পাঠাইতেন তখন খুব ভোর বেলায় পাঠাইতেন। হজরত ছখর নিজেও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি যখন কর্ম-চারীদিগকে ব্যবসায়ের জন্য পাঠাইতেন তখন খুব ভোরে ভোরে পাঠাইতেন। ইহাতে তাঁহার বেশী মুনাফা হইত ও মাল খুব বাড়িয়া গিয়াছিল।

عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) مَنْ بَاعَ

عَقَارًا اَوْدَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهٗ

ابن ماجة

হজরত ছায়াদ বিন হোরায়েছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি কোন জমীন অথবা ঘর বিক্রি করিয়া সেই টাকা অন্য কোন সমপরিমাণ কাজে না লাগাইল তবে তাহার জন্য সেই মালে কোন বরকত হয় না।

ছাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে হজরত আবু বকর ছিদ্দীক একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ব্যবসায়ী হিসাবেই তাঁহার পরিচিতি ছিল। হুজুরের নবুওয়ত প্রাপ্তির সময় তাঁহার নিকট চল্লিশ হাজার দেরহাম ছিল। ঐ টাকা দিয়া তিনি গোলাম আজাদ করিতেছিলেন এমন কি যখন তিনি হিজরত করিয়া মদীনায়ে মোনাওয়ারা গেলেন তখন তাঁহার নিকট মাত্র পাঁচ হাজার দেরহাম ছিল। এবং মৃত্যুর সময় তিনি কিছুই রাখিয়া যান নাই। হুজুর (ছঃ) এর জীবদ্দশায় তিনি ব্যবসা উপলক্ষে বছরা শহর গমন করেন। এবনে ছায়াদ লিখিয়াছেন হজরত আবু বকর ছিদ্দীককে যখন খলীফা নিয়োগ করা হইল তখন পরের দিন ভোর বেলায় তিনি কাপড়ের গাঁইট মাথায় করিয়া বাজারে রওয়ানা হইলেন। ইত্যবসরে হজরত ওমর ও হজরত আবু ওবায়দার সহিত সাক্ষাত হইল। তাঁহারা বলিলেন, ইহা আপনি কি করিয়া করিতে পারেন অথচ মুছলমানদের কত বড় দায়িত্ব আপনার মাথায় চাপিয়াছে? তিনি বলিলেন, আমি আপন পরিবার পরিজনকে কোথা হইতে খাওয়াইব? তাঁহারা আরজ করিলেন, আমরা আপনার জন্য বায়তুল মাল হইতে কিছু বেতন ধার্য করিয়া দিব। ইহার পরিপ্রেক্ষিত তাঁহার জন্য একটা বকরীর মূল্যের কিছুটা অংশ পরিমাণ তাঁহার বেতন ধার্য করা হইল। বোখারী শরীফের শরায় এবনে জাকারী লিখিয়াছেন, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যাহারা মুছলমানের সাহাযার্থে আত্মনিয়োগ করে যেমন কাজী, মুফতী, মোদাররেছ তাহাদের সহিতও ঐরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত।

হজরত ওমর (রাঃ) ব্যবসা করিতেন। তিনি যে কোন হাদীছ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না তার কারণ স্বরূপ স্বয়ং বলিতেন, বাজারে আসা-যাওয়ার কারণে অনেক হাদীছ হইতে আমি বঞ্চিত থাকিতাম। বহু

মোহাদ্দেছীনের বর্ণনা মতে হজরত ওমর (রাঃ) বলিতেন, জেহাদের ময়দানে মৃত্যু বরণ ব্যতীত আমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় হইল নিজের পরিশ্রম ও মেহনতের দ্বারা জীবিকা অর্জন করার মধ্যে মৃত্যু বরণ করা। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলওয়াত করেন–

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ –

অর্থাৎ– "অন্য একদল মুছলমান রহিয়াছে যাহারা খোদা প্রদত্ত রিজিকের তালাশে আল্লাহ্‌র জমীনে চলা– ফেরা করে।"

হজরত ওছমান (রাঃ) বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। জাহেলিয়াত এবং ইছলাম উভয় যুগেই ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁহার খ্যতি ছিল। মেশকাত শরীফে বর্ণিত আছে, হুজুরে পাক (ছঃ) তবুকের যুদ্ধের জন্য যখন চাঁদা উসুল করিতেছিলেন তখন হজরত ওছমান (রাঃ) রসদ সামগ্রীসহ তিনশত উট দান করেন। অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে, হজরত ওছমান (রাঃ) আস্তিনের ভিতর এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া প্রিয়নবীর খেদমতে পেশ করেন। হুজুর উহাকে আপন কোনের মধ্যে উলট পালট করিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলেন, আজ হইতে কোন আমল ওছমানের জন্য ক্ষতির কারণ হইতে পারিবে না। হুজুর (ছঃ) এইভাবে দুইবার এরশাদ করেন। অন্য জায়গায় লিখিত আছে, হজরত ওছমান এক হাজার উট এবং সত্তরটি ঘোড়া দান করেন।

'তারতীবুল এদারিয়া' গ্রন্থে ব্যবসায়ীদের ফিরিস্তির মধ্যে হজরত খাদীজাতুল কোবরার নামও লিখিত আছে। তাঁহার ব্যবসায়ী হওয়া এবং সিরিয়ায় দ্রব্যসামগ্রী সহকারে লোকজনকে পাঠানো সর্বজন বিদিত ঘটনা। তিনি স্বীয় গোলাম মাইছারাকে সঙ্গে দিয়া হুজুরে পাক (ছঃ) কে সাম দেশে পাঠাইতেন এবং বলিতেন অন্যদেরকে আমি মুনাফার যে অংশ দিব আপনাকে উহার দ্বিগুণ দান করিব। হুজুর (ছঃ) সাম দেশে গিয়া বছরার বাজারে মাল বিক্রি করিয়া অন্য মাল খরিদ করিয়া ফিরিয়া আসেন।

হজরত খাদীজাতুল কোবরার মালে সেই ছফরে অন্যান্যের তুলনায় দ্বিগুণ মুনাফা হইয়াছিল। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া মা খাদীজা প্রিয়নবীকে আগের সিদ্ধান্তের চেয়েও ডবল দিয়াছিলেন।

হজরত জোবায়ের বিন আওয়ামও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনি তেজারতের মধ্যে খুব বেশী মুনাফা করিয়াছেন। তিনি উত্তর করিলেন, আমি কখনও ত্রুটিযুক্ত খারাপ মাল খরিদ করি না।

বোখারী শরীফে হজরত আবদুর রহমান বিন্ আউফের ঘটনা এই ভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, যখন আমরা মদীনা শরীফে হিজরত করিয়া আসি তখন প্রিয় নবী আমার এবং ছায়াদ বিন্ রাবীর মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব কায়েম করিয়া দেন। ছায়াদ বিন্ রাবী বলেন, আমি আনছারদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী ব্যক্তি। আমি আমার সম্পত্তির অর্ধেক আপনাকে দিয়া দিতেছি। এবং আমার দুই বিবি আছে, উভয়ের মধ্যে যাহাকেই আপনার পছন্দ হয় তাহাকে আমি তালাক দিয়া দিতেছি, ইদ্দত পুরা হইবার পর আপনি তাহাকে বিবাহ করিয়া নিন। আমি তাহাকে বলিলাম "বা-রাকাল্লাহু ফী মালেকা অ-আহ্লেকা" অর্থাৎঃ আল্লাহ পাক আপনার মালে এবং পরিবারে বরকত দান করুন। এই হাদিয়ার আমার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি আমাকে বাজারের রাস্তা দেখাইয়া দিন, যেখানে লোক ব্যবসা-বাণিজ্য করে। কথা মোতাবেক তাঁহাকে বনি কাইনোকার বাজার দেখাইয়া দেওয়া হইল। তিনি সেখানে গিয়া প্রথম দিনে ব্যবসা শুরু করিয়া মুনাফা বাবত বিকাল বেলায় অনেকগুলি পনীর এবং ঘি নিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় দিনও ঐ ভাবে করিলেন। এইরূপ অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বিবাহ করিয়া ফেলিলেন। এবং প্রিয় নবীজীর খেদমতে হাজির হই-লেন। হুজুরে আকদাছ (ছঃ) তাঁহার কাপড়ে কিছুটা হলদে রং দেখিতে পাইলেন যাহা বিবির কাপড় হইতে লাগিয়া গিয়াছিল। হুজুর (ছঃ) বলি-লেন, আবদুর রহমান, এটা কি? আরজ করিলেণ, ইয়া রাছুলাল্লাহ! আমি একজন আনছারী মহিলাকে শাদী করিয়াছি। এরশাদ হইল মোহর বাবত

তুমি তাহাকে কি দিয়াছ? তিনি আরজ করিলেন, খেজুরের দানা বরাবর একটা স্বর্ণের টুকরা দিয়াছি। প্রিয় নবী এরশাদ ফরমাইলেন, একটা বকরী দিয়া হইলেও অলীমার ব্যবস্থা কর। হজরত আবদুর রহমান বিন্ আউফকে আল্লাহ পাক এত বেশী মাল দৌলত দিয়াছিলেন যে, মৃত্যুর পূর্বে ঐ মহিলাকে যখন তালাক দিয়াছিলেন তখন আপোস মিমাংসায় সেই মহিলাকে তাঁহার মালের আট ভাগের এক ভাগের তিন ভাগের এক ভাগ দিয়াছিলেন, তাহাতেও মেয়ে লোকটার অংশে তিরাশী হাজার পড়িয়াছিল। এত বড় ধন সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি বড় দানশীলও ছিলেন। আম্মাজান হজরত আয়েশা (রাঃ) একবার তাঁহার পুত্র আবু ছালমাকে বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্ তোমার পিতাকে জান্নাতের ছালছাবীল নহর দ্বারা সম্মানিত করুন। দোয়া করার কারণ এই ছিল যে, আবদুর রহমান হুজুর (ছঃ) কে একটা বাগান দান করিয়াছিল যাহা পরে তখনকার দিনের চল্লিশ হাজার টাকায় বিক্রি হইয়াছিল। (মেশ্‌কাত)

'তারতীবুল এদারিয়া' গ্রন্থে মোয়াজ্জেন হজরত ছায়াদ বিন্ আয়েজের ব্যবসায়ের উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি হজরত আম্মার বিন ইয়াছেরের আজাদ করা গোলাম ছিল। তিনি কোরজ নামক এক প্রকার পাতার ব্যবসা করিতেন। সেই পাতা দ্বারা কাঁচা চামড়াকে রং করা হইত। এই জন্য লোকে তাহাকে ছায়াদুল কোরজ বলিয়া ডাকিত। ইমাম বগবী বর্ণনা করিয়াছেন, একবার তিনি প্রিয় নবীজীর খেদমতে স্বীয় অভাবের কথা জানাইলেন। হুজুর (ছঃ) তাঁহাকে তেজারত করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বাজারে গিয়া কিছু কোরজ পাতা খরিদ করিয়া বিক্রি করিলেন। ইহাতে তাঁহার কিছুটা মুনাফা হইয়াছিল। হুজুরের খেদমতে উহার উল্লেখ করিলেন। দয়ার নবী (ছঃ) তাহাকে এই জিনিসেরই কারবার করিবার হুকুম দিলেন।

আবু মায়ালেক আনছারীও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি নিজের মাল এবং অন্যের মাল নিয়া দেশ দেশান্তরে গমনাগমন করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি একজন বিখ্যাত আবেদ, পরহেজগার এবং

মোস্তাজাবুদ্দাওয়াত ছিলেন, হজরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ কাপড়ের তেজারত করিতেন। তাঁহার দৈনিক আয় ছিল এক হাজার আওকিয়া। এক একটা আওকিয়া একটা দীনারের সমমান ছিল।

বোখারী শরীফে হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, তোমরা বলিতেছ যে, আবু হোরায়রা অনেক বেশী হাদীছ বয়ান করিয়া ফিরিতেছে অথচ আনছার মোহাজের অন্য কেহ এত অধিক হাদীছ বয়ান করিতে পারে না। আসল কথা হইল আমার মোহাজের ভাইয়েরা ব্যবসা উপলক্ষে বাজারেই বেশী বেশী থাকিত। আর আমি প্রিয় নবীর (ছঃ) দরবারে পড়িয়া থাকিতাম। তাহারা যখন অনুপস্থিত থাকিত আমি তখনও উপস্থিত থাকিতাম। আমি আছহাবে ছোফফার একজন মিছকীন ছিলাম। একদিন হুজুর (ছঃ) বয়ানের ভিতর এরশাদ ফরমাইলেন, যে কেহ আমার এই ওয়াজের ভিতর নিজের চাদর বিছাইয়া লইবে ও বয়ানের শেষে চাদর শরীরে জড়াইয়া লইবে সে আমার যাবতীয় কথা কণ্ঠস্থ করিয়া নিতে পারিবে। হুজুরের এরশাদ মোতাবেক আমি চাদর বিছাইয়া দিলাম ও বয়ান শেষে উহা বুকে জড়াইয়া নিলাম, তারপর হইতে যাবতীয় হাদীছ আমার স্মরণ থাকিয়া যাইত (বোখারী মোছলেম)

ছাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যে জড়িত ছিলেন।

কৃষি কাজ

ব্যবসায়ের পর আমার নিকট সব চেয়ে উত্তম পন্থা হইল জীবিকার জন্য কৃষি কাজ। কৃষি সম্পর্কে হাদীছ শরীফে হজরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, কোন মুছলমান যদি একটা গাছ লাগাইল অথবা ক্ষেত্রে ফসল লাগাইল অতঃপর উহা হইতে কোন মানুষ অথবা পাখী অথবা কোন জীবজন্তু কিছুটা খাইল তবে ইহা তাহার জন্য ছদকার মধ্যে পরিগণিত হইবে। মোছলেম শরীফে হজরত জাবের হইতে অন্য একটি হাদীছ বর্ণিত আছে যে, উহা হইতে যদি কেহ কিছু চুরি করিয়াও লইয়া গেল তবে উহাও ছদকার মধ্যে গণ্য হইবে।" প্রয়োজন হিসাবেও কৃষি কাজ ও ফসল উৎপাদনের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। কেননা ফসল না হইলে মানুষ খাইবে কোথা হইতে?

কৃষি কর্মের ফজীলত সম্পর্কে কোরানে পাকেও কয়েক স্থানে বর্ণিত আছে এবং আল্লাহ পাক যে আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন উহা তাঁহার বিরাট এহ্ছান, ইহা অনেক জায়গায় উল্লেখ রহিয়াছে। পানি বর্ষণের ইঙ্গিত হইল ফসল উৎপাদন করা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন।

وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ

كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا

"তিনিই সেই মহান আল্লাহ যিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন, তারপর উহার সাহায্যে সব রকম চারা বাহির করিয়াছি। অতঃপর উহা হইতে সবুজের সমারোহ পয়দা করিয়াছি যদ্বারা ফসলের দানা সমূহ বাহির করিয়াছি, যাহারা (কী সুন্দর) একে অপরের সঙ্গে মিনিয়া থাকে আবার খেজুরের গাবার ভিতর ফলের ছড়া সমূহ ঝুঁকিয়া থাকে। এবং আপোসে মিনিয়া মিশিয়া বা পৃথক পৃথক ভাবে আঙ্গুরের, জয়তুনের ও আনারের বাগানসমূহ পয়দা করিয়াছি। তোমরা প্রত্যেক বৃক্ষের ফল সমূহকে দেখ যখন উহাতে ফল লাগে এবং পাকিবার উপক্রম হয়। নিশ্চয় এই সব বস্তুর মধ্যে বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নিদর্শণ রহিয়াছে।"

এই ভাবে ক্ষেত খামার ও বাগান লাগাইবার উপর আরও আয়াত বর্ণিত আছে। ছুরায়ে হুদে এরশাদ হইতেছে –

هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ

ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ –

"তিনিই তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর জমীনের বুকে তোমাদিগকে আবাদ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার নিকট তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁহার দিকে রুজু কর। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অতি নিকটে প্রার্থনা কবুলকারী।

ইমাম আবু বকর জাছ্ছাছ (রাঃ) বলেন, এই আয়াতের দ্বারা জমীনকে আবাদ করা ওয়াজেব প্রতিপন্ন হইতেছে। চাই উহা ফসলের দ্বারা হউক, চাই উহা বাগান লাগাইয়া হউক বা ঘর-বাড়ী দানান-কোঠা বানাইয়া হউক। কোন ব্যক্তি চারাগাছ লাগাইয়া সেই গাছ দ্বারা মৃত্যুর পরেও যদি কেহ উপকৃত হয় তবে মৃত ব্যক্তি ছওয়াব ছদ্কায়ে জারিয়া হিসাবে পাইতে থাকিবে।

হজরত আনাছ (রাঃ) হইতে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে, প্রিয় নবী এরশাদ করেন, যদি কেয়ামত আসিয়া যায় আর তোমাদের কাহারও হাতে একটা খেজুরের দানা থাকে তবে সম্ভব হইলে কেয়ামত হইয়া যাইবার পূর্বেই যেন দানাটা জমীনে লাগাইয়া ফেলে। অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে, হজরত ওমরের সহিত ইয়ামনের কয়েকজন লোকের সহিত সাক্ষাত হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমরা কারা? তাহারা উত্তর করিল আমরা মোতাওয়াক্কেলীন জামাত। হজরত ওমর বলেন, তাওয়াক্কুলের দাবীতে তোমরা মিথ্যাবাদী। প্রকৃত মোতওয়াক্কেলত ঐ ব্যক্তি যে জমীনে বীজ বপন করিয়া তারপর আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে।

উল্লেখিত রেওয়ায়েত সমূহের বিপরীতমুখী আরেকটি রেওয়ায়েত আছে, যাহা হজরত আবু ওমামা হইতে বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে অর্থাৎ হজরত আবু ওমামা একদিন কোন এক ব্যক্তির নিকট কৃষিকর্মের কিছু উপকরণ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, আমি হুজুরে পাক (ছঃ) এর নিকট শুনিয়াছি, যেই ঘরে এইসব আছবাব প্রবেশ করিবে, উহা সেই সব ঘরে জিল্লতও দাখেল করিয়া দেয়। অর্থাৎ তাহারা ইজ্জত ও মর্যাদার জীবন অতিবাহিত করিতে পারেনা। (মেশকাত)

মোহাদ্দেছীনগণ এই হাদীছের বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি খাজনার জমীতে ফসল বুনিয়াছিল। খাজনা আদায় করাটাও এক প্রকার অপদস্ত হওয়া। অথবা কেহ যদি কৃষি কাজে এত বেশী লিপ্ত হইয়া যায় যে, যদ্দরা দ্বীন ও দুনিয়া তাহার বরবাদ হইয়া যায়। অথবা ঐ জমির কথা বলা হইয়াছে যেখান হইতে সরকার বিভিন্ন প্রকার টেক্স উসুল করিয়া থাকে, ইহা রীতিমত একটা বেইজ্জতির ব্যাপার। অথবা এই হুকুম

ইছলামী হুকুমতের সীমান্তবর্তী ওয়ালাদের জন্য। যেহেতু তাহারা যদি কৃষি কাজে লিপ্ত থাকে তবে কাফেরগণ তাহাদের উপর অতর্কিতে হামলা করিয়া বসিতে পারে। কেহ কেহ হাদীছের এই অর্থ ইহাও করিয়াছে যে, সেই জমানায় কৃষিকাজ করা ছিল জিম্মিদের কাজ আর মুছলমানগণ ব্যবসা বাণিজ্যে ও ধর্মীয় কাজ করিত, তাই ছাহাবাদের ক্ষেতখামারে লিপ্ত হওয়াকে প্রিয় নবী (ছঃ) পছন্দ করিতেন না। আবার কেহ কেহ বলেন, যার নিকট চাকর নওকর ও মজদুর ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও নিজে কৃষি কাজে লিপ্ত হয় তার বিষয় বলা হইয়াছে।

মূল কথা হইল এই যে, প্রত্যেক কাজেরই একটা সীমারেখা আছে, নিয়ত পরিষ্কার ও শরীয়তের গন্ডির ভিতর থাকিয়া সব কাজ করিতে হইবে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে–

জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত তিন ব্যক্তি

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিবস সর্বপ্রথমে যাহাদের হিসাব নিকাশ হইবে তাহারা হইল তিন প্রকার লোক। সর্বপ্রথম এক জন শহীদকে ডাকা হইবে। তাহার উপর যত প্রকার নিয়ামত দান করা হইয়াছিল সব তাহাকে দেখানো হইবে। সে সব কিছু স্বীকার করিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিবে, এইসবের মোকাবেলায় তুমি কি আমল করিয়াছ? সে বলিবে তোমার রাস্তায় জেহাদ করিয়াছি ও শহীদ হইয়া গিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। তুমি শুধু এই জন্যই লড়াই করিয়াছ যে, লোকে তোমাকে বীর পুরুষ বলিবে। উহাতো বলা হইয়াছে। তারপর আল্লাহপাক হুকুম করিবেন ও তাহাকে অধঃমুখী করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইবে।

তারপর দ্বিতীয় একজন আলেম ব্যক্তিকে আনা হইবে। যে এলেম শিখিয়াছে এবং কোরানে পাক পাঠ করিয়াছে। তাহার উপর বর্ষিত আল্লাহ পাকের যাবতীয় নেয়ামত তাহাকে দেখানো হইবে। সে ঐসব স্বীকার করিবে। আল্লাহ পাক বলিবেন এইসবের মোকাবেলায় তুমি কি কি আমল করিয়াছ? সে বলিবে, আমি এলেম শিক্ষা করিয়াছি। লোক জনকে শিক্ষা দিয়াছি। এবং কালামে পাক তেলাওয়াত করিয়াছি। আল্লাহপাক

বলিবেন, তুমি মিথ্যাবাদী। হ্যাঁ এলেম এই জন্য শিখিয়াছিলে যে, লোকে তোমাকে আলেম বলিবে এবং কোরানে পাক এই জন্য পড়িয়াছিলে যে, মানুষ তোমাকে ক্বারী বলিবে, উহাত বলা হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা হুকুম করিবেন, তখন তাহাকে অধঃমুখী করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

তৃতীয় বার একজন ধনী ব্যক্তিকে আনা হইবে। যাহাকে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন প্রকার ধনসম্পদ দান করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা যখন তাহাকে বিভিন্ন প্রকার ধন সম্পদের বর্ণনা দিবেন তখন সে সব কিছুই স্বীকার করিবে। আল্লাহ পাক বলিবেন, ঐসবের মোকাবেলায় তুমি কি কি নেক কাজ করিয়াছ? সে বলিবে, এমন কোন রাস্তা নেই যেখানে আমি খরচ করি নাই। আল্লাহ পাক বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। হ্যাঁ তুমি ঐসব এই জন্য করিয়াছিলে যে, লোকে তোমাকে বড় দানবীর বলিবে। তারপর হুকুম করা হইবে ও সেই ব্যক্তিকে অধঃমুখী করিয়া টানা হেঁছড়া করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইবে। (মেশ্‌কাত)

অথচ এলেমের মত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু, শাহাদত এবং ছাখাওয়াতের মত বুজুর্গ ও গুরুত্বপূর্ণ আমল শুধু মাত্র বদনিয়তির কারণে বরবাদ হইয়া গেল এবং সর্বপ্রথমে তাহাদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

বেচা-কেনা তেজারতের এতসব ফজীলত থাকা সত্ত্বেও যদি উহার সহিত সুদ আসিয়া মিশ্রিত হয় তবে ছওয়াবের পরিবর্তে কত বড় আজাবের যোগ্য হইয়া যায়। শাহাদাত এবং এলেমের ফজিলত সর্বজন বিদিত। উহাদের ফজীলতে কতশত আয়াত এবং হাদীছ বর্ণিত আছে, কিন্তু নিয়ত খারাপ হওয়ার দরুণ সর্বাগ্রে তাহারাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

ইজারারও যথেষ্ট ফজীলত বর্নিত আছে, কিন্তু উহার সময়সীমার ব্যাপারে যদি কিছু ত্রুটি হইয়া যায় তবে উহা জানের উপর বিপদ হইয়া দাঁড়ায়।

হজরত মাওলানা মাজহার নানাতবী (রহঃ) সম্পর্কে খ্যাতি আছে যে, মাদ্রাসায় পড়া লেখার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি ব্যক্তিগত কাজের জন্য কেহ আসিত তবে তিনি চুপে চুপে ঘন্টা দেখিয়া নিতেন এবং লোকটি

চলিয়া যাইবার পর দ্বিতীয়বার ঘন্টা দেখিয়া যত মিনিট উহাতে ব্যয় হইয়াছে নোট করিয়া লইতেন এবং মাসের শেষ দিকে সব একত্র করিয়া সেই পরিমাণ সময়ের বেতন না নিয়া বাকীটুকু গ্রহণ করিতেন।

হজরত মাওলানা কাছেম নানাতবী (রঃ) মীরঠে মুন্সি মোমতাজ আলী ছাহেবের ছাপাখানায় কাজ করিতেন। কোন কোন সময় প্রেসে আসিতে যদি হজরতের দুই এক মিনিট বিলম্ব হইয়া যাইত বা নিদৃষ্ট সময়ের মধ্য ভাগে বা শেষ ভাগেও যদি ওজর বশতঃ কিছু সময় নষ্ট হইয়া যাইত তবে তিনি ঐ সমস্ত মিনিটগুলি নোট করিয়া রাখিতেন, মাসের শেষে বেতন নেওয়ার সময় সেই পরিমাণ সময়ের বেতন তিনি কিছুতেই গ্রহণ করিতেন না।

হজরত শায়খুল হাদীছ ছাহেব এরশাদ করেন, আমার শ্রদ্ধেয় মোর্শেদ হজরত ছাহারানপুরী (রহঃ) এক বৎসর হেজাজের ছফরে কাটাইয়া যখন ১৩৩৪ হিজরীতে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আমার আব্বাজান এন্তেকাল করিয়া যান। ছাহারানপুরী ছাহেবের অনুপুস্থিতিতে আব্বাজান তাঁহার হাদীছের কিতাব পড়াইতেন, কিন্তু তিনি বেতন নিতেন না। হজরতও দেশে ফিরিয়া সেই সময়ের বেতন গ্রহণ করেন নাই।

শায়খুল ইছলাম হজরত মাদানী (রহঃ) হজ্বে যখন যাইতেন তখন যেহেতু মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থাকিতেন কাজেই উক্ত সময়ের বেতন তিনি কবুল করিতেন না। একবার তিনি অসুস্থাবস্থায় মাদ্রাসা হইতে এক মাসের ছুটি নিয়াছিলেন। মাদ্রাসার কানুন মোতাবেক সেই মাসের বেতন যখন তাঁহার খেদমতে পেশ করা হয় তিনি বলেন, আমি যখন পড়াই নাই বেতন কি করিয়া নিব? তাঁহার এন্তেকালের পর সেই বেতন তাঁহার বিবির খেতমতে পেশ করা হইলে তিনিও এই বলিয়া ফেরত দেন যে, হজরত যখন জীবদ্দশায় উহা গ্রহণ করেন নাই আমি উহা কি করিয়া গ্রহণ করিতে পারি? হজরত মাদানী (রহঃ) ১৩৪৫ হিজরীতে যখন দেওবন্দ মাদ্রাসার হেড মাওলানা নিযুক্ত হন তখন তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট বিশটা শর্ত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উনিশ নম্বর শর্ত ছিল– মাদ্রাসার খেদমতের সময় আমার যদি কোন ত্রুটি হয় তবে বাধ্যতামূলক ভাবে আমার বেতন হইতে সেই সময়টুকুর অংশ কাটিয়া রাখিতে হইবে।

কৃষি কাজের বর্ণনা

কৃষি কাজ প্রসঙ্গে হুজুরে পাক (ছঃ) এর হাদীছ মেশকাত শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهٗ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ -

হজরত ছায়ীদ বিন্ যায়েদ হইতে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, যে কোন ব্যক্তি অন্যায় ভাবে কাহারও অর্দ্ধ হাত জমি আত্মসাৎ করিবে কেয়ামতের দিন উহার সাত তবক পর্যন্ত জমি তাহার গলায় জিঞ্জিরের মত লট্‌কাইয়া দেওয়া হইবে। (বোখারী, মোছলেম)

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এরশাদ করেন, বেচা-বিক্রির দ্বারা ধনসম্পদ অর্জন করার জন্য মাছলা-মাছায়েল শিক্ষা করা প্রত্যেক মুছলমানের উপর ওয়াজেব। কেননা এলেম তলব করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরজ। আর যে ব্যক্তি যেই কাজে লিপ্ত হয় তাহার জন্য সেই বিষয়ের এলেম শিক্ষা করা ফরজ। তবেইত কি রূপ আচরণ করিলে মোয়ামেলা ঠিক থাকিবে ও কিরূপ করিলে উহা শরীয়ত মোতাবেক নষ্ট হইয়া যাইবে ঐ সমস্ত তরীকা জানা যাইবে। সুতরাং ব্যবসা বাণিজ্য হউক বা কৃষি কাজ হউক উহার বিষয় এই পরিমাণ এলেম জানা অত্যন্ত জরুরী যদ্বারা জায়েজ এবং নাজায়েজ সম্পর্কে অন্ততঃ পার্থক্য বুঝা যায়। 'তারতীবুন এদারিয়া' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ইছলামের প্রাথমিক যুগে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বেচা বিক্রির হুকুম আহকাম ও আদব কায়েদা না জানিত ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করিত না।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম গাজ্জালী ঐ বিষয়ে একমত যে, কোন বালেগ মুছলমানের জন্য যে কোন কাজে অগ্রসর হওয়া ঐ পর্যন্ত নাজায়েজ যে পর্যন্ত সে উক্ত বিষয়ে আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম মানিয়া না

লইবে। যেমন ইজারা কর্জ নামাজ ইত্যাদি কাজ করিতে হইলে উহার মাছায়েলও জানিতে হইবে। কোরানে পাকেও উহার প্রমাণ রহিয়াছে। হজরত নূহ (আঃ) এরশাদ করেন–

انى اعوذ بك ان اسئلك ما ليس لى به علم –

অর্থাৎ "যেই ছুয়াল জায়েজ হওয়া সম্পর্কে আমার এলেম নাই আমি, উহা হইতে পানাহ চাহিতেছি"

কেননা হজরত নূহ (আঃ) যখন নৌকায় ছেলেকে সঙ্গে লইবার জন্য আল্লার দরবারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তখন আল্লাহ পাক তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, তোমার এই চাওয়া ঠিক হয় নাই। এখানে আল্লহ্র তরফ হইতে সাবধান বাণী ও নূহ (আঃ) কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা উভয়টাই প্রমাণ করে যে, কোন কাজ শুরু করার পূর্বে উহা জায়েজ কি নাজায়েজ সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এলেম থাকা জরুরী। অন্য আয়াতে আসিয়াছে

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ –

'যে বিষয় তোমার পূর্ণমাত্রায় জ্ঞান নাই সে বিষয় তুমি আমল করিতে পার না।'

এই আয়াতে আল্লাহ পাক স্বয়ং তাহার অজানা জিনিসের অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সুতারং কোন কাজকে ঐপর্যন্ত আরম্ভ করা জায়েজ নাই যতক্ষণ পর্যন্ত উহার বিষয় জ্ঞান হাছেল না হয়। ইহা দ্বারা প্রতিয়মান হইল যে, এলেম হাছেল করা যে কোন ছুরতে জরুরী। এই জন্য ই প্রিয়নবী এরশাদ করেন–

"এলেম তলব করা প্রত্যেক মুছলমানের উপর ফরজ।"

ইমাম শাফেয়ী (রহ্ঃ) বলেন, এলেম তলব দুই প্রকার। প্রথমতঃ ফরজে আইন, দ্বিতীয় ফরজে কেফায়া । ফরজে আইন ঐ এলেমকে বলা যায় যাহা উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য উছিলা স্বরূপ হয়। উহা ব্যতীত বাকী এলেম ফরজে কেফায়া।

'রওহাতুল মোশ্তাবেকা' গ্রন্থে লিখিত আছে, হজরত ওমর (রাঃ) বলেন, অজমের এই সমস্ত মুর্খ লোকেরা কেনা–কাটার মাছায়েল যতক্ষণ

পর্যন্ত না জানিবে ততক্ষণ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। উহার মূল ভিত্তি ও প্রিয়নবীর আমল হইতেই পাওয়া যায়। কেননা হুজুরে আকরাম (ছঃ) প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে যেই কাজ করিতে চাহিত সেই কাজের হুকুম-আহকাম শিক্ষা দিতেন। আল্লামা মাজাজী লিখিয়াছেন, আমাদের ওলামাদের মতানুসারে যেই ব্যক্তি বেচা-বিক্রির মাছায়েল সম্পর্কে অবগত নহে তাহার জন্য বেচা-কেনা করা বা বাজারে বসা জায়েজ নাই।

ইমাম মালেক (রহঃ) "কিতাবুল কেরজ ও মোদারবানা" গ্রন্থে ফরমা-ইয়াছেন, আমার নিকট লেনদেনের মোয়ামেলা করা ঐ ব্যক্তির জন্য নাজায়েজ, যে স্বীয় মুর্খতা বশতঃ হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম জানার পার্থক্য করিতে না পারে। যদিও সে মুছলমান হউক। একটি রেওয়ায়েতে আছে, হজরত ওমর (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে এই ফরমান দিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, যাহারা বেচা-কেনার মাছলা-মাছায়েল না জানে তাহাদিগকে যেন বাজার হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, যাহারা কেনা-কাটার মাছায়েল না জানিয়া বাজারে বসিত হজরত ওমর (রাঃ) কখনও কখনও তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করিতেন, এবং বলিতেন, আমাদের বাজারে ঐসব লোক বসিতে পারিবেনা যাহারা সুদের মাছায়েল সম্পর্কে অবগত নহে। ইমাম মালেক সাহেবও ঐসব লোককে বাজার হইতে বাহির করিয়া দিবার হুকুম দিতেন যাহারা বেচা-কেনার মাছায়েল জানিত না। কথিত আছে, তাঁহার জমানায় দারোগাগণ বাজারে গিয়া প্রত্যেক দোকানে দোকানে গিয়া দোকান্দারদিগকে সুদ সম্পর্কীয় মাছায়েল জিজ্ঞাসা করিত যে, উহা হইতে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায়। যাহারা সঠিক উত্তর দিতে পারিত তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিত। আর যাহারা উত্তর দিতে অপারগ হইত তাহাদিগকে এই বলিয়া বাহির করিয়া দিত যে, মুছলমানদের বাজারে তোমাদের জন্য বসা জায়েজ নাই। যেহেতু তোমরা মানুষকে সুদ এবং নাজায়েজ বস্তু খাওয়াইতেছ।

'কুওয়াতুল কুলুব' গ্রন্থে লিখিত আছে, হজরত ওমর (রাঃ) মাঝে মাঝে বাজারে চক্কর লাগাইতেন এবং কোন কোন ব্যবসায়ীকে মাছায়েল

না জানার দরুন বেত্রাঘাত করিতেন এবং বলিতেন, যাহাদের মাছলা-মাছায়েল জানা আছে তাহাদেরই বাজারে বসিবার অধিকার রহিয়াছে নতুবা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সুদ খাইয়াই ফেলিবে। 'কাজুল ওম্মাল' গ্রন্থেও ঐরূপ উল্লেখ রহিয়াছে।

'তাম্বিহুল মোগতার্‌রিন' গ্রন্থে লিখিত আছে, হজরত ইমাম মালেক (রহ্ঃ) সরকারী আমলাদিগকে নির্দেশ দিতেন তাহারা যেন ব্যবসায়ীদিগকে ইমাম মালেকের সম্মুখে হাজির করে। তিনি তাহাদিগকে হালাল হারামও মোয়ামেলাতের মাছায়েল জিজ্ঞাসা করিতেন। উত্তর দিতে পারিলে বাজারে কারবার করিবার অনুমতি দিতেন। নতুবা বাজার হইতে বাহির করিয়া দিয়া বলিতেন, প্রথমে মাছায়েল শিক্ষা করিয়া আস তারপর বাজারে বসিবে। কেননা আহকাম জানা না থাকিলে সুদ খাইয়া ফেলিবে।

আল্লামা জরক্কানী 'শরহে মোখতাছার' গ্রন্থে ইমাম মালেক হইতে বর্ণনা করেন, ব্যবসায়ীদের সাক্ষ্য ঐ পর্য্যন্ত গ্রহণযোগ্য হইবেনা যেই পর্য্যন্ত তাহারা ব্যবসা সংক্রান্ত মাছায়েল শিখিয়া না লইবে।

'ফতুয়ায়ে তাতার খানিয়া' গ্রন্থে ফতুয়ায়ে ছেরাজিয়া হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি ঐ পর্যন্ত তেজারতে লিপ্ত হইতে পারিবে না যেই পর্য্যন্ত সে বেচা-কেনার আহকাম সম্পর্কে অবগত না হইবে যে, কোন্‌টা জায়েজ এবং কোন্‌টা নাজায়েজ।

'ফতুয়ায় বাজ্জাজিয়ায়' বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তির জন্য ঐ পর্যন্ত তেজারতে মশগুল হওয়া না জায়েজ যেই পর্যন্ত সে বেচা-কেনার মাছায়েল মুখস্থ করিয়া না লইবে। প্রাথমিক যুগে মাছায়েল না জানা কোন ব্যক্তি যদি তেজারতের ছফর করিত তখন প্রয়োজন মোতাবেক মাছলা-মাছায়েল জিজ্ঞাসা করার জন্য এক বিজ্ঞ আলেমকে তাহার সঙ্গে করিয়া লইত।

হজরত ইমাম মোহাম্মদ (রহ্ঃ) এর খেদমতে লোকজন আসিয়া আরজ করিয়াছিলেন, আপনি পরহেজগারী সম্পর্কে একটি কিতাব লিখুন। তিনি বলেন, আমি বেচা-কেনা সম্পর্কে একটা কিতাব লিখিয়াছি। উহার মাছায়েলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি কোন ব্যক্তি কেনা-কাটা করে এবং নাজায়েজ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকে তবে সে মোত্তাকী বা পরহেজগার

বনিয়া যাইবে। তাহার উপার্জন হালাল হইবে এবং আমল ভাল হইয়া যাইবে। (বলুগুল আমান)

হালাল হারাম সম্পকীয় সঠিক পন্থা জানিতে হইলে হজরত থানবী (রহ্ঃ) এর 'ছফাইয়ে মোয়ামেলাত' বই পাঠ করা খুবই উপকারী হইবে, কেননা উহাতে তেজারত সম্পকীয় খুটিনাটি বিষয়টি লিখিত হইয়াছে। মোছনাদে ইমাম আহমদ, বয়হাকী, ছুনানে দায়লমী ইত্যাদি গ্রন্থে যেই সমস্ত হাদীছ বর্ণিত আছে উহার সারমর্ম হইল এই যে, নামাজ রোজা ইত্যাদি ফরজের পর হালাল উপার্জন করাও ফরজ। উপার্জন হালাল হইলে তাহার দোয়া কবুল হয়। হারামের একটা লোক্‌মা পেটে প্রবেশ করিলে উহার পরিণতিতে চল্লিশ দিন যাবত দোয়া কবুল হয় না। দশ দেরহামের একটা কাপড়ে এক দেরহাম অর্থাৎ চার আনা পরিমাণ হারাম মাল মিশ্রিত হইলেও সেই কাপড় যতদিন পরিধানে থাকিবে নামাজ কবুল হইবে না। হারাম মাল দ্বারা ছদকা খয়রাতও কবুল হয় না আর সেই মাল খরচ করিলে উহাতে বরকতও হয় না। হারাম তরীকায় উপার্জিত মাল রাখিয়া মরিয়া গেলে উহা তাহাকে জাহান্নামে পৌছাইয়া ছাড়িবে। হারাম মাল দ্বারা প্রতিপালিত শরীর বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে না। বরং উহা দোজখেরই উপযোগী।

হজরত থানবীর 'হালুয়া রুটি নামক কবিতার সারাংশ হইল– হালাল জীবিকার বিশেষত্ব হইল, উহা দ্বারা অন্তরের নূর, এলেমের মধ্যে পুর্ণতা, হেকমত, মহব্বত, নেকখেয়াল, সৎসাহস ও হুজুরীয়ে কুলব ইত্যাদি হাছেল হয়। পক্ষান্তরে হারাম মাল ভক্ষণ করিলে দ্বীন হইতে দূরত্ব, মারফতের নূর হইতে বঞ্চিত, খাহেশে নফছের বৃদ্ধি, এবাদতে নিরুৎসাহ এবং দ্বীনের বরবাদী ইত্যাদি হাছেল হয়। হারামের লোভ হইতে বাঁচিবার উপায় হইল ক্বানায়াত অর্থাৎ অল্পে তুষ্টি, স্বীয় খোরাক পোশাক ও খরচাদির ব্যাপারে সহজ সরল পন্থা অবলম্বন করা। এবং রং ঢং ও সাজ সজ্জা ইত্যাদি বর্জন করা। সুতরাং আল্লাহ্‌র আজাব ও গজব হইতে নাজাত পাওয়ার জন্য খুব তাড়াতাড়ি এলাজ করা উচিত।

মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহ্ঃ) 'জাওয়াহেরুল ফেক্‌হ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, মানুষ নিতান্ত অজ্ঞতা এবং ভুলবশতঃ ইছলামী কানুনকে

কঠিন মনে করিয়া থাকে, বরং কঠিন এবং সংকীর্ণতা তো শুধু মাত্র মানুষের স্বাধীনভাবে চলার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, কেননা তাহাদের নিকট হালাল হারামের মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই। একটা ব্যাপার যাহা সাধারণ পরিবর্তনের দরুন হালাল হইবার ছিল উহা সামান্য অসাবধানতার কারণে হারাম হইয়া যায়। হজরত মুফতী ছাহেব বলেন, হালাল রুজী হাছেল করা কিছুটা কষ্টসাধ্য বটে কিন্তু মনে রাখা উচিৎ যে, সামান্য কয়েকদিনের ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীর জন্য কত শত প্রকার কষ্ট ও ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে, যদি আখেরাতের চিরস্থায়ী হায়াত ও অসীম নেয়ামত হাছেল করা ও আপন মনিবকে রাজী খুশী করার জন্য সামান্য কিছুটা কষ্টই উঠাইন তবে উহা এমন কি বড় কথা হইল? বিশেষতঃ যখন কষ্ট করিয়া রুজী হাছেল করিলে ছওয়াবও অনেকগুণ বাড়িয়া যায় যেমন হাদীছ শরীফে ওয়াদা রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালাও ওয়াদা করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি তাঁহার রেজামন্দী হাছেল করার ফিকিরে লাগিয়া যায় তিনি তাহার জন্য অনেক অসুবিধার মধ্যেও সহজ সরল পন্থাসমূহ বাহির করিয়া দেন–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا –

অর্থাঃ "যাহারা আমার রাস্তায় চলার কোশেশ করিবে আমি তাহাদিগকে নিশ্চয় নিশ্চয় আমার রাস্তা দেখাইয়া দিব।"

ব্যস্তবিক পক্ষে এই জমানায় মনুষের বিভিন্ন কার্য্যকলাপে যেই সমস্ত অন্যায় ও অবৈধ আচরণ পরিলক্ষিত হয় উহার মধ্যে সামান্য একটু সাবধানতা অবলম্বন করিয়া কিছুটা রদবদল বা পরিবর্তন করিতে পারিলেই অনেক নাজায়েজ কাজও হালাল এবং জায়েজে পরিণত হইয়া যাইতে পারে। হ্যাঁ কাহারও যদি হালাল তলব করার অন্বেষা থাকে তবেই উহা সম্ভব।

একটি রহস্যপূর্ণ ঘটনা

হজরত শায়খুল হাদীছ সাহেব বলেন, আমি "আকাবেরে ওলামায়ে দেওবন্দ" গ্রন্থে লিখিয়াছি, আমার বয়স যখন বার বৎসর হইয়াছিল তখন আমি আব্বাজানের সহিত গঙ্গুহ শরীফ হইতে ছাহারানপুর চলিয়া যাই। আব্বাজানের অভ্যাস ছিল মাদ্রাসার নিদৃষ্ট সময়ে তিনি মাদ্রাসায় থাকিতেন। আর খাওয়া এবং আরামের সময় তিনি বেশীর ভাগ ঘরেই কাটাইতেন।

এই উভয় সময়ের মধ্যে যেই সময়টুকু বাঁচিত মাদ্রাসার নিকটস্থ মুচিদের মসজিদে সেই সময় অতিবাহিত করিতেন। একবার আমার আব্বা মুচি মসজিদের কুয়ার ধারে বসা অবস্থায় ছিলেন। হঠাৎ দুই তিন জন ইউরোপিয়ান ছাত্র কুয়ার উপর দাঁড়াইয়া দমাদম কুপ হইতে বালতি দিয়া পানি উঠাইয়া আব্বাজানের মাথায় ঢালিতে আরম্ভ করেন। এক বাল্‌তি শেষ না হইতেই আরেক বাল্‌তি ঢালা শুরু হইয়া যাইত। মৌলবী এমদাদ সাহেবের পিতা হাফেজ মকবুল মরহুম ছাহেব আমার পিতার খুব ভক্ত ছিলেন, তিনি প্রায় প্রতিদিন আছরের নামাজের সময় সেখানে উপস্থিত থাকিতেন। তিনি ব্যাপারটা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, হযরতজী। ইহা কি এছরাফ নয়? অর্থাৎ পানি কি অতিরিক্ত খরচ হইতেছে না? আমার আব্বাজান উত্তর করিলেন, তুমি হইলে একজন জাহেল ব্যক্তি আর আমি হইলাম এক জন মৌলবী। হাফেজ সাহেব বলিলেন, ইহাত সেই কথাই হইল যে, মৌলবী সাহেব প্রত্যেক বস্তুকে জায়েজ করিয়া লয়। আমার আব্বা বলিলেন, মৌলবী বলিয়াছি এই কথায় আমি বাস্তবিকই লজ্জিত। তবে মনে রাখিবে এই কাজ যদি তুমি কর তবে নাজানার দরুন তোমার গোনাহ হইবে, আর কোন কোন মৌলবী ঐ কাজকে জায়েজ করিয়া করিবে। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আব্বাজান বলেন প্রথমে তোমাকে আরবী শিখিতে হইবে।

আমার আব্বাজান প্রায়ই একটা কথা বলিতেন, এই সব ব্যস্তসমস্ত লোকেরা অর্থাৎ উকিল এবং ইংরেজী স্কুলের মাস্টারগণ আমাকে যদি বাহাত্তর ঘন্টা সময় দিত তবে আমি তাহাদিগকে মৌলবী বানাইয়া দিতাম। বরং তাঁহার নেছাবের চেয়ে কম সময়ের মধ্যে সেই জমানার কয়েকজন উকিল বেশ ভাল আলেম হইয়া গিয়াছিলেন। বরং কিছু লোক প্রতি রবিবার তাঁহার নিকট মাত্র দুই ঘন্টা করিয়া পড়িয়া আলেম হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সেই জমানার বিখ্যাত উকিল মৌলবী শেহাবুদ্দিন এবং মৌলবী মনফায়াত আলী ছাহেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হাফেজ মকবুল ছাহেব ও আব্বাজানের মধ্যে হাসি খুশীর ভিতর কথা কাটাকাটি হইতেছিল। আমার তখন কিছুতেই বুঝে আসিতেছিল না যে, আব্বাজান কেন বলিতেছেন, আরবী পড় মৌলবী হইয়া যাইবে। সেই সময়

এই এছরাফ ওয়ালা ঘটনা আমারও বুঝে আসিতেছিল না। কিন্তু যখন মেশকাত শরীফে সুদের বয়ানের মধ্যে হজরত আবু ছায়ীদ খুদরীর (রাঃ) হাদীছ পাঠ করি তখন আমার সব বুঝে আসিয়া যায়। হাদীছ হইল এই যে, হজরত বেলাল (রাঃ) প্রিয়নবীর খেদমতে উন্নতমানের কিছু খেজুর পেশ করেন। হুজুর (ছঃ) প্রশ্ন করলেন তুমি এই খেজুর কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছ? হজরত বেলাল উত্তর করেন আমার নিকট দুই 'ছা' নিম্নমানের খেজুর ছিল আমি উহার বিনিময়ে এক 'ছা' উন্নতমানের খেজুর খরিদ করিয়াছি। প্রিয় হাবীব (ছঃ) বলিয়া উঠিলেন, হায় হায়। ইহাত একেবারেই সুদ হইয়া গেল। হুজুর (ছঃ) আরও এরশাদ করেন এইরূপ কখনও করিবেনা যদি এইরূপ করিতেই হয় তবে খারাপ খেজুরগুলি বিক্রি করিয়া দিবে আর উহার মূল্য দিয়া ভাল খেজুর খরিদ করিয়া নিবে। হজরত শয়খুল হাদীছ বলেন, এই হাদীছ পড়া মাত্রই আমার সেই মু-চিদের মস্‌জিদের বাত্‌তির কথা মনে আসিয়া গেল যে মৌলবী এবং জাহেলের মধ্যে পার্থক্য হইল এই যে, জাহেল দুই ছা এর বিনিময়ে ভাল এক 'ছা' খরিদ করে। যাহা সম্পূর্ণ জায়েজ। এখানে যদিও জিনিস একই হইল, কিন্তু জাহেলের আমল হইল সুদ আর আলেমের আমল হইল জায়েজ। হুজুরে পাক (ছঃ) কী সুন্দর পন্থা বাত্‌লাইয়া দিলেন যদ্বারা সামান্য একটু খানেক রদ বদলের দরুন কত বড় মারাত্মক একটা বস্তু জায়েজে পরিণত হইয়া গেল।

হজরত শায়খুল হাদীছ বলেন, আমাদের মাদ্রাসার প্রথম মোহতামেম হজরত মাওলানা এনায়েতে এলাহী ছাহেবের অভ্যাস ছিল যখন মদ্রাসার চাঁদা হিসাবে কোন অলঙ্কারাদি আসিত তিনি তাহা অন্যের হাতে না দিয়া নিজ হাতে বিক্রি করিতেন। তখনকার দিনে হীরা নামক একজন স্বর্ণকার ছিল তাহার নিকটই তিনি অলঙ্কারাদি বেচা-বিক্রি করিতেন। স্বর্ণকার হীরাও মোহতামেম ছাহেবের খুব ভক্ত হইয়া গিয়াছিল। যখন কোন স্বর্ণের অলঙ্কার বিক্রি করিতেন তখন প্রথমে তিনি স্বর্ণকার হইতে কিছু রূপার টাকা ধার নিতেন। উক্ত ধার করা টাকা দিয়া স্বর্ণালঙ্কার বেচা-বিক্রি করিয়া আসিবার সময় কর্জের টাকা ফেরৎ দিয়া আসিতেন। এইভাবে চাঁদির অলঙ্কার বিক্রির সময় স্বর্ণ ধার করিতেন ও মোয়ামেলা শেষ করিয়া

আশরাফী ফেরৎ দিয়া আসিতেন। স্বর্ণকার হীরা জিজ্ঞাসা করিত। হজরত হের ফেরের প্রয়োজন কি? ব্যাপারটাত একই হইল। মোহতামেম ছাহেব তাহাকে বুঝাইয়া দিতেন যে, আমাদের ধর্মে স্বর্ণ রূপার বেচাকেনার মধ্যে আল্লাহ রাছুলের আইনের মোতাবেক বিশেষ একটা তরীকা রহিয়াছে। এইসব জানিয়া সেই হীরা বাবুও এ ব্যাপারে যথেষ্ট পারদর্শী হইয়া গিয়াছিল। অতএব তাহার নিকট ঐরূপ মোয়ামেলা করার জন্য যদি সাধা-রণ মানুষ আসিত তবে সে তাহাকে মাছলা সম্পর্কে অবগত করাইয়া দিত। কিন্তু যখন কোন মৌলবী ধরনের লোক আসিত তখন প্রথমেত বেচাকেনা করিয়া লইত, তারপর মৌলবী সাহেব ফিরিয়া যাইবার সময় হীরা। বাবু তাহাকে বলিত, আপনি যেই কাজ করিলেন আপনাদের ধর্মেত ইহা নাজায়েজ। হীরার কথা শুনিয়া মৌলবী সাহেব চমকিয়া উঠিত। আবার অনেকে ত জোশের মধ্যে আসিয়া বলিয়া ফেলিত, আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে আমরা বেশী জানি নাকি তুমি বেশী জান? লোকটি খুব বৃদ্ধ ছিল, সে বলিত মৌলবী সাহেব রাগ করিবেন না। আমার কথা শুনুন তারপর তাহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিত। ইহাতে মৌলবী সাহেব চিন্তায় পড়িয়া যাইতেন ও লজ্জিত হইয়া যাইতেন। কেননা প্রকৃত মাছআলা সম্পর্কে মৌলবী ছিলেন জাহেল ও মোশরেক ব্যক্তি ছিল ওয়াকেফহাল।

পরিণাম হিসাবে যদিও জিনিস এক কিন্তু হজরত বেলাল (রাঃ) এর খেজুরের মত সামান্য রদ বদলের দরুন নাজায়েজ বস্তুও জায়েজে পরিণত হইয়া যায়।

সংক্ষিপ্ত কথা হইল এই যে, ব্যবসা হউক বা কৃষি কাজ অথবা ইজারা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই হালাল হারামের অন্বেষণ করা খুবই জরুরী। সাধারণ মানুষের দেখার বস্তুত নয় কিন্তু আহলে এলেম এবং আরবী জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য দেখা খুবই প্রয়োজন।

আল্লামা জাহাবী কিতাবুল কাবায়েরে লিখিয়াছেন, আটাইশ নম্বর কবীরা গোনাহ্ হইল যে কোন তরীকায় হারাম খাওয়া বা হারাম জিনিস ব্যবহার করা।

ইমাম জাহাবী প্রথমে এই আয়াত শরীফ লিখিয়াছেন-

ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل -

যাহার অর্থ হইল এই যে, "কেহ কাহারও মাল বাতেল তরীকায় খাইবে না"

অতঃপর লিখিয়াছেন, বাতেল তরীকায় খাওয়ার দুইটা তরীকা রহিয়াছে। প্রতমতঃ জুলুম করিয়া খাওয়া, যেমন ডাকাতি চুরি অথবা খেয়ানত করিয়া হাছেল করা। দ্বিতীয়তঃ হাসি ঠাট্টা করিয়া কাহারও মাল নিয়া নেওয়া। যেমন জুয়া অথবা খেল তামাশার ভিতর দিয়া কাহারও মাল আত্মসাত করা। ছহী বোখারীতে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, "নিশ্চয় অনেক লোক অবৈধভাবে আল্লাহ পাকের মালের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া থাকে। কেয়ামতের দিবস তাহাদের ঠিকানা হইল দোজখ।

মোছলেম শরীফে বর্ণিত আছে, নবীয়ে করীম (ছঃ) এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করেন, যে বহু দূর দুরন্তর ছফর করিয়া আসিয়াছে, তাহার মাথার চুল এলোমেলো হইয়া পড়িয়াছে, সমস্ত শরীর ধূলায় ধুষরিত হইয়া গিয়াছে, সে আকাশের দিকে হাত উঠাইয়া ইয়া রব। শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রার্থনা করিতে থাকে। আর তার অবস্থা হইল এই যে, তাহার খানাপিনা লেবাছ পোশাক সব কিছুই হারাম অর্থাৎ হারামের মালেই সে প্রতিপালিত। এমতাবস্থায় তাহার দোয়া কি করিয়া কবুল হইতে পারে?

হজরত আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাছুল-ল্লাহ! দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক আমাকে মোস্তাজাবুদ্দাওয়াত বানাইয়া দেন, অর্থাৎ আমার সব দোয়াই যেন মকবুল হয়। প্রিয় হাবীব এরশাদ করেন, হে আনাছ। হালাল তরীকায় কামাই রোজগার কর, তবেই তোমার দোয়া কবুল হইয়া যাইবে। কেননা কোন ব্যক্তি যদি হারামের একটা লোকমা মুখে দেয় তবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাহার কোন দোয়া কবুল হয় না।

ইমাম বয়হকী হুজুরে আকরাম (ছঃ) এর এই এরশাদ বর্ণনা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদের আখলাক ঐভাবে বন্টন করিয়াছেন যেই ভাবে রিজিক বন্টন করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা যাহাকে মহব্বত করেন

তাহাকেও দুনিয়া দান করেন আর যাহাকে মহব্বত করেন না তাহাকেও দান করেন। আর যাহাকে তিনি দ্বীন দান করেন তাহাকে তিনি মহব্বত করেন। যে ব্যক্তি হারাম মাল উপার্জন করিয়া উহা হইতে খরচ করিল তাহার মালে কোন বরকত হয় না। ছদকা করিলে উহা কবুল হয় না। পিছনে ছাড়িয়া গেলে উহা তাহাকে জাহান্নামে পৌঁছাইয়া ছাড়িবে। নিশ্চয় পরওয়ারদেগার অন্যায়কে অন্যায়ের দ্বারা দূরীভূত করেন না। বরং অন্যায়কে নেকীর দ্বারা মিটাইয়া দেন।

হজরত এবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন; দুনিয়াটা একটা মিষ্টি এবং সবুজ শ্যামল বস্তু। যেই ব্যক্তি উহার মধ্যে হালাল তরীকায় মাল দৌলত উপার্জন করে এবং উহাকে নেক রাস্তায় খরচ করে আল্লাহ পাক তাহাকে পূণ্য দান করিবেন এবং বেহেশ্ত দান করিবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অবৈধ পন্থায় মাল উপার্জন করিল এবং উহাকে অন্যায় পন্থায় খরচ করিল, তাহাকে অপদস্তের ঘর অর্থাৎ জাহান্নামে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। এইরূপ বহুলোক রহিয়াছে যাহারা খা-হেশে নফছের বশবর্তী হইয়া হারাম মালে প্রবেশ করিয়া যায় তাহাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম রহিয়াছে। অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে, যেই ব্যক্তি এই কথার পরওয়া করে না যে, মাল দৌলত কোথা হইতে উপার্জন করিল, আল্লাহ তায়ালাও পরওয়া করিবেন না যে, দোজখের কোন্ দরওয়াজা দিয়া জাহান্নামে প্রবেশ করাইবেন।

হজরত আবু হোরায়রা (রহঃ) এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেহ নিজের মুখে মাটি ভর্তি করিয়া লইবে ইহা তাহার জন্য উহা হইতে উত্তম যে, আপন মুখে হারাম মাল প্রবেশ করাইবে।

হজরত ইউসুফ এবনে আছবাত (রহঃ) বলেন, কোন যুবক ব্যক্তি যখন এবাদতে লিপ্ত হইয়া যায় তখন শয়তান তাহার সাঙ্গ পাঙ্গদিগকে বলে, দেখ এই ব্যক্তির খোরাক কোথা হইতে আসিয়াছে। তারপর লোকটার খাওয়া পরা যদি নাজায়েজ তরীকায় হওয়া সাব্যস্ত হয় তবে সাথীদিগকে বলিতে থাকে, এই লোকের পিছনে তোমরা পড়িও না। তাহার জন্য ফিকির করা বা তাহার পিছনে অনর্থক পরিশ্রম করার কোন প্রয়োজন নাই। সে এবাদতের নামে শুধু শুধু পরিশ্রমই করিতে থাকুক। যেহেতু হারাম মাল খাওয়া

অবস্থায় তাহার এবাদত কোন কাজেই আসিবে না।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, একজন ফেরেশ্‌তা প্রত্যেক দিনে এবং রাত্রে বায়তুল মোকাদ্দাসে শুধু এই আওয়াজ দিতে থাকে যে, যেই ব্যক্তি হারাম মাল ভক্ষণ করিবে আল্লাহ পাক তাহার ফরজ নফল কিছুই কবুল করিবেন না।

হজরত আবদুল্লাহ্ এবনে মোবারক বলেন, সন্দেহজনক একটি দেহরাম ফিরাইয়া দেওয়া আমার নিকট একলক্ষ একশত দেরহাম ছদকা করার চেয়েও অধিক প্রিয়।

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি হারাম মাল দ্বারা হজ্ব করিবে এবং সে যখন লাব্বায়েক বলিবে, তার উত্তরে ফেরেশ্‌তাগণ বলিতে থাকে, তোমার 'লাব্বায়ক' 'ছা'দায়েক' সব কিছুই নিরর্থক। তোমার হজ্ব তোমাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। মোছনাদে ইমাম আহমদে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, "কোন ব্যক্তি দশ দেরহাম দিয়া একটা কাপড় খরিদ করিলে উহার মধ্যে যদি একটা দেরহামও হারামের থাকে তবুও যেই পর্যন্ত তাহার শরীরে সেই কাপড় থাকিবে তাহার নামাজ কবুল হয় না।

ওহাব বিন বের্দ (রহঃ) বলেন, তুমি যদি খুঁটির মত তন্ময় হইয়াও নামাজে দন্ডায়মান থাক তবু তাতে তোমার কোন ফায়দা হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাহক্বীক না করিবে যে, তোমার পেটে যাহা যাইতেছে উহা হালাল না হারাম। হজরত আবদুল্লাহ এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তির নামাজ কবুল করিবেন না যাহার পেটে হারাম খাদ্য প্রবেশ করিয়াছে।

হজরত ছুফিয়ান ছওরী (রহঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি হারাম মাল নেক কাজে খরচ করিবে তাহার দৃষ্টান্ত এইরূপ যেমন কোন ব্যক্তি নাপাক কাপড় পেশাব দ্বারা পবিত্র করিতেছে। অথচ নাপাক কাপড়কে শুধুমাত্র পানিই পরিষ্কার করিতে পারে। এই ভাবে গোনাহকে শুধু মাত্র হালালই মিটাইতে পারে। হজরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা হালালের দশ ভাগের নয় ভাগ এই ভয়ে ছাড়িয়া দিতাম যে, হারামের মধ্যে গ্রেপ্তার হইয়া পড়ি

নাকি। অন্য হাদীছে প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, ঐ শরীর বেহেশ্তে প্রবেশ করিতে পারিবেনা যাহা হারাম মাল দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছে।

হারাম মাল ভক্ষণকারী কারা?

ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন, হারাম মাল ভক্ষণকারীদের ফিরিস্তির মধ্যে নিম্নলিখিত লোকসমূহ শামিল-

অন্যায়ভাবে টেক্স উসুলকারী, খেয়ানতকারী, চোর, ডাকাত, সুদ খোর, সুদ দাতা, এতিমের মাল ভক্ষণকারী, মিথ্যা সাক্ষী দাতা, কাহারও মাল হাওলাত লইয়া অস্বীকার করনেওয়ালা, ঘুসখোর, ওজনে কম দেনেওয়ালা, দোষনীয় বস্তুর দোষ ঢাকিয়া বিক্রি করা, জুয়াড়ী, যাদুকর, জ্যোতির্বিদ, যাহারা জানদারের ছবি তৈয়ার করে, জিনাকার মেয়েলোক, মৃত ব্যক্তির উপর যেই সব নারী পয়সা নিয়া কান্নাকাটি করে, বিক্রেতার অনুমতি ব্যতীত যেই দালাল নিজের পারিশ্রমিক নিয়া নেয় এবং খরিদ্দারকে অতিরিক্ত মূল্য বাতলায়, আজাদ ব্যক্তিকে যে বিক্রি করিয়া খায়, ইহারা সবাই হারাম মাল ভক্ষণকারীদের মধ্যে শামেল।

নবীয়ে করীম (ছঃ) এরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন এইরূপ কিছু লোককে পেশ করা হইবে যাহাদের সহিত তেহামা পাহাড় বরাবর নেকী থাকিবে, কিন্তু ঐ সব নেকী যখন দরবারে এলাহীতে পেশ করা হইবে তখন উহা ধুনা রুইয়ের মত উড়িয়া যাইবে অর্থাৎ নেকীর কোন পাত্তাই থাকিবে না, অতঃপর ঐসবকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইবে। ছাহাবারা আরজ করিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ! ইহা কেমন ব্যাপার হইল? হুজুর এরশাদ ফরমাইলেন, ইহারা নামাজ পড়িত, রোজা রাখিত, জাকাত আদায় করিত, হজ্বও করিত, কিন্তু এইসব সত্ত্বেও যখনই কোন সামান্যতম হারাম মালও সামনে আসিত কোন প্রকার চিন্তা ভাবনা না করিয়া উহা গ্রহণ করিত। এই জন্য আল্লাহ পাক তাহাদের যাবতীয় আমল বরবাদ করিয়া দিয়াছেন।

একটি সুইয়ের জন্য বেহেশ্তে যাওয়া বন্ধ

জনৈক বুজুর্গের এন্তেকালের পর অন্য এক বুজর্গ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, জনাব! আপনার সহিত কি

রকম ব্যবহার করা হইয়াছে? তিনি উত্তর করিলেন, ব্যবহার ভালই করা হইয়াছে তবে কথা হইল এই যে, একটা সুইয়ের জন্য বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিতেছি না। এই সুইটা আমি কোন একজন হইতে ধার নিয়াছিলাম, অতঃপর উহা ফেরৎ দেই নাই।

আল্লামা জাহাবী অন্য এক অধ্যায়ে বর্ণনা করেন, বাষট্টি নম্বর কবীরা গোনাহ হইল ওজনে কম দেওয়া। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ –

অর্থাৎ 'ঐ সব লোকের জন্য ধ্বংস যাহারা ওজন করার সময় মানুষের হক্ব নষ্ট করিয়া থাকে। যখন মানুষ থেকে স্বীয় হক্ব উসুল করে তখন পূরা পুরা আদায় করিয়া লয়। আর যখন মানুষের হক্বসমূহ আদায় করিতে থাকে তখন কম করিয়া দেয়।'

হজরত আবদুল্লাহ এব্‌নে আব্বাছ হইতে বর্ণিত আছে, প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেন, পাঁচটি জিনিস পাঁচটি জিনিসের বদলে। ছাহাবারা আরজ করিলেন, হুজুর! পাঁচটি জিনিস পাঁচটি জিনিসের বদলে– ইহার অর্থ কি? হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন –

(১) যখন কোন জাতি ওয়াদা ভঙ্গ করে তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের শত্রুদিগকে তাহাদের উপর জয়যুক্ত করিয়া দেন।

(২) যখনই কোন জাতি আল্লাহ পাকের নির্দেশিত ফয়ছলার পরিবর্তে অন্য কোন ফয়ছালা করে তখনই তাহারা গরীব এবং মোহতাজ হইয়া পড়ে।

(৩) যখন কোন জাতির মধ্যে ব্যাপক ভাবে ব্যভিচার (জিনা) দেখা দেয় তখন আল্লাহ পাক তাহাদের উপর প্লেগ চাপাইয়া দেন।

(৪) আর যখনই কোন জাতি ওজনে কম দিতে আরম্ভ করে তখনই খোদায়ে পাক তাহাদের সুখ শান্তি দূর করিয়া দেন এবং তাহাদিগকে দুর্ভিক্ষে নিপতিত করেন।

(৫) আবার যখন কোন জাতি জাকাত আদায় করার ব্যাপারে কার্পণ্য করিতে থাকে তখন তাহাদের জন্য বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দেন।

হজরত মালেক বিন দীনার (রহঃ) বলেন, আমি মৃত্যু শয্যায় জনৈক প্রতিবেশীকে দেখিতে যাই। সে বলিতেছিল আগুনের দুইটি পাহাড়, আগুনের দুইটি পাহাড়। আমি বলিলাম, ইহা তুমি কি বলিতেছ? সে বলিল, আমার

নিকট দুইটা টুক্‌রি ছিল, একটা দ্বারা মাপিয়া লইতাম অন্যটা দ্বারা মাপিয়া দিতাম। আর এগুলি আপোসে ছোট বড় ছিল। হজরত মালেক বিন দীনার বলেন, আমি টুকরি দুইটা লইয়া একটাকে অন্যটার উপর মারিতে লাগিল–াম, লোকটি বলিতে লাগিল, আপনার এই মারার দরুন আমার শাস্তি আরো বাড়িয়া গিয়াছে। অতঃপর লোকটি সেই অসুখেই মৃত্যুবরণ করে।

মোতাফ্‌ফেফ ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে ওজনে কম দেয়। তফিফ শব্দের অর্থ সাধারণ বস্তু। অর্থাৎ এত সাধারণ বস্তুও সে চুরি করিতে পারে এই কম দেওয়াটাও চুরি খেয়ানত এবং হারাম খাওয়ার শামিল। ইহাদের জন্য আল্লাহ পাক 'ওয়েল' অর্থাৎ কঠিন আজাবের ধমকি দিয়া রাখিয়াছেন। কোন কোন বুজর্গ বলিয়াছেন, 'ওয়েল' জাহান্নামের মধ্যে একটা ময়দানের নাম। যদি উহার মধ্যে দুনিয়ার সমস্ত পাহাড়কে ঢালিয়া দেওয়া হয় তবুও উহার তেজে সব গলিয়া যাইবে। কোন কোন বুজুর্গ বলেন, মাপের দ্বারা যাহারা ব্যবসা করে তাহারা সবাই জাহান্নামে যাইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কেননা এই কাজ করিয়া নেনদেনে কম বেশী করা হইতে কেহ রক্ষা পাইতে পারে না। হ্যাঁ যাহাকে আল্লাহ পাক হেফাজত করেন একমাত্র তিনিই বাঁচিতে পারেন। অন্য এক বুজুর্গ বলেন, আমি জনৈক রুগীকে তাহার মৃত্যু সন্ধিক্ষণে দেখিতে যাই। আমি তাহাকে কালেমার তালক্বীন করিতে থাকি, কিন্তু তার মুখ দিয়া কিছুতেই কালেমা বাহির হইতেছিলনা। লোকটির যখন সামান্যটুকু হুশ হইয়ছিল তখন আমি তাহাকে বলিলাম ভাই, আমি তোমাকে কালেমা পড়াইতেছি, তোমার মুখ দিয়া উহা কেন বাহির হইতেছে না? সে বলিতে লাগিল, আমার জবানের সামনে তরাজু প্রতিবন্ধক হইয়া আসিতেছে, কাজেই কালেমা পড়া আমার সম্ভব হইতেছে না। আমি বলিলাম, তুমি মাপে কম দিতে নাকি? সে বলিল, না হুজুর! তবে কথা হইল এই যে, আমি যখন মাপঝোপ করিতাম তখন তরাজু ঠিক হইয়া দাঁড়াইবার জন্য অপেক্ষা করিতাম না। অতএব চিন্তা করিবার বিষয় এই যে, পাল্লা ঠিক না হওয়ার দরুন যখন এই দূরবস্থা তখন মাপে যাহারা কম দেয় তাহাদের অবস্থা কত গুরুতর হইবে?

হজরত নাফে (রাঃ) বলেন, হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বাজারে সওদাগরদের নিকট গিয়া বলিতেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে

থাক এবং মালপত্র খুব গুরুত্ব সহকারে ওজন দিবে, কেননা যাহারা ওজনে কম দিবে তাহারা কেয়ামতের দিন এই ভাবে হাজির হইবে যে, তাহাদের ঘাম নীচ হইতে শুরু করিয়া কানের অর্ধাংশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে এই দুরবস্তা ঐসব কাপড় ব্যবসায়ীদেরও হইবে যাহারা বিক্রির সময় কাপড় খুব শক্ত করিয়া ধরে এই জন্য যে, বিন্দুমাত্র কাপড় যেন বেশী না যায়। আর যখন নিজে মাপিয়া লয় তখন হাত ঢিলা করিয়া ধরে যেন তাহার অংশে কিছু কাপড় বেশী আসিয়া যায়। কোন কোন বুজুর্গানে দ্বীন বলিয়াছেন, ধ্বংস ঐ ব্যাক্তির জন্য যে একটি নিকৃষ্ট দানার বিনিময়ে এতবড় জান্নাতকে জলাঞ্জলী দিয়া দেয় যাহার প্রশস্ততা হইল জমীন ও আছমানের বরাবর। আর বহুত বড় আফছোছ ঐ ব্যাক্তির জন্য যে একটা দানা বেশী লইয়া নিজের জন্য ধ্বংসকে খরিদ করিয়া লয়।

হজরত শায়খুল হাদীছ বলেন, আমার অন্তর চাহিয়াছিল যে, এই কিতাবটাকে একটু বিস্তারিত ভাবে লিখি, কিন্তু বর্তমানে আমি বিভিন্ন রোগের শিকারে পরিণত হইয়াছি, সুতরাং প্রত্যেক বিষয়ে লেখা শুরু করার সময় এ ধারণা হইতেছিল যে, হয়তঃ ইহাও শেষ করিতে পারিবনা। কাজেই বাধ্য হইয়া অদ্য সোমবার ৫ই ছফর ১৪০০ হিজরী এই কিতাবটা সমাপ্ত করিয়া দিলাম। আল্লাহ পাক এই সংক্ষিপ্ত কেতাবখানা স্বীয় রহমত ও বখ্‌শিশের দ্বারা কবুল করুন এবং মুছলমানদিগকে হালাল রুজী খাওয়ার এবং হারাম হইতে বাঁচিবার তৌফিক দান করুন এবং এই অধমকেও উহার তৌফিক বখ্‌শিশ করুন।

اٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَمَنْ تَبِعَهٗ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ اٰمِيْنَ -

হজরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা মোহাম্মদ জাকারিয়া ছাহেব দা - মাত বারাকাতুহুম, মোহাজেরে মাদানী।

৫ই ছফর ১৪০০ হিঃ মোতাবেক ২৪ শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ অনুবাদ সমাপ্ত ২০ শে রমজান ১৪০১ হিঃ ।